আকাইদ ও ফিক্‌হ

اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

اَلصَّفُّ السَّابِعُ لِلدَّاخِلِ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আকাইদ ও ফিক্‌হ

اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

দাখিল
সপ্তম শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম
ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ
আ. ন. ম. মাহবুবুর রহমান
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	অক্টোবর ২০২৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, তাকওয়াসম্পন্ন, সৎ এবং সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি নৈতিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সৎ ও দক্ষ জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ্ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে 'আকাইদ ও ফিক্হ' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর চেতনাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর মিঞা মোঃ নূরুল হক

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ : আল আকাইদ

অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়	আল আকাইদ	১	৬ষ্ঠ অধ্যায়	ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান	৩৩
১ম পাঠ	সহিহ আকিদার পরিচয়	১	১ম পাঠ	কুরআনে বর্ণিত ফেরেশতাগণের কার্যক্রম	৩৩
২য় পাঠ	ভ্রান্ত আকিদার কুফল	২	২য় পাঠ	কিরামান কাতেবিনের কাজ	৩৫
২য় অধ্যায়	আদ দ্বীন	৬	৩য় পাঠ	মুনকার ও নাকিরের পরিচয় ও দায়িত্ব	৩৫
১ম পাঠ	দীনের পরিচয় ও মৌলিক দিক	৬	৭ম অধ্যায়	কিতাবসমূহের প্রতি ইমান	৩৯
২য় পাঠ	ইমানের শাখাসমূহ	৭	১ম পাঠ	আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমানের গুরুত্ব	৩৯
৩য় পাঠ	তাযকিয়ার পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা	৮	২য় পাঠ	কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব	৪০
৩য় অধ্যায়	আল্লাহর প্রতি ইমান	১২	৩য় পাঠ	কুরআনের বিধান অস্বীকার করার পরিণাম	৪১
১ম পাঠ	কুরআনের আলোকে আল্লাহর প্রতি ইমান	১২	৮ম অধ্যায়	আখেরাতের প্রতি ইমান	৪৫
২য় পাঠ	সুন্নাহর দৃষ্টিতে ইমান	১৩	১ম পাঠ	চিরস্থায়ী আখিরাত জীবনে মুক্তির আশা	৪৫
৪র্থ অধ্যায়	আত তাওহিদ	১৬	২য় পাঠ	আমলনামা ও হাউযে কাউসার	৪৬
১ম পাঠ	তাওহিদের স্তরসমূহ	১৬	৯ম অধ্যায়	তাকদিরের প্রতি ইমান	৫০
২য় পাঠ	আল আসমাউল হুসনা	১৭	১ম পাঠ	তাকদিরের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস	৫০
৩য় পাঠ	আল্লাহর ইবাদত	২১	২য় পাঠ	তাকদিরের উপর বিশ্বাস না করার পরিণাম	৫১
৫ম অধ্যায়	নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমান	২৬	১০ম অধ্যায়	সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আকিদা	৫৪
১ম পাঠ	আল কুরআনে বর্ণিত নবি ও রাসুল	২৬	১ম পাঠ	সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় ও মর্যাদা	৫৪
২য় পাঠ	নবি ও রাসুলের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য	২৮	২য় পাঠ	সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৫৫
৩য় পাঠ	রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি	২৯	৩য় পাঠ	সাহাবিগণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে	৫৬

দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিক্‌হ

১ম অধ্যায়	ইলমে ফিক্‌হের ইতিহাস	৫৯	১ম পাঠ	আহকামুস সালাত	৮৮
১ম পাঠ	ফিক্‌হের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৫৯	২য় পাঠ	সালাতের কিরাআত	৯৬
২য় পাঠ	মাযহাবের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা	৬০	৩য় পাঠ	কাযা সালাত	৯৭
৩য় পাঠ	ইমামগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৬১	৪র্থ পাঠ	সালাতুল বিতর	১০১
২য় অধ্যায়	নাজাসাত	৬৬	৫ম পাঠ	জানাযা সালাত	১০৫
১ম পাঠ	নাজাসাত পরিচিতি ও প্রকারভেদ	৬৬	৬ষ্ঠ পাঠ	নফল সালাত	১১৫
২য় পাঠ	নাজাসাতযুক্ত পানির বিধান	৬৮	৬ষ্ঠ অধ্যায়	সাওম	১১৭
৩য় পাঠ	কয়েকটি নাজাসাত (নাপাক) প্রাণী	৬৯	১ম পাঠ	আহকামুস সাওম	১১৭
৩য় অধ্যায়	তাহারাত	৭২	২য় পাঠ	নফল সাওম	১২৫
১ম পাঠ	পবিত্রতা অর্জন ও পবিত্রকরণ	৭২	৭ম অধ্যায়	যাকাত	১৩০
২য় পাঠ	তায়াম্মুম	৭৮	১ম পাঠ	যাকাতের পরিচয় ও ফযিলত	১৩০
৩য় পাঠ	মেসওয়াক	৮২	২য় পাঠ	যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ	১৩২
৪র্থ অধ্যায়	সালাতের জন্য ইকামত	৮৫	৩য় পাঠ	যার উপর যাকাত ফরয	১৩৩
১ম পাঠ	ইকামতের পরিচয়	৮৫	৪র্থ পাঠ	যাকাত আদায় না করার পরিণাম	১৩৪
২য় পাঠ	ইকামতের সুন্নত তরিকা	৮৬	৫ম পাঠ	যেসব সম্পদের যাকাত ফরয	১৩৫
৫ম অধ্যায়	আস সালাত	৮৮	৮ম অধ্যায়	পানাহার	১৩৮

তৃতীয় ভাগ : আল আখলাক

১ম অধ্যায়	উত্তম চরিত্র	১৪৩	৩য় অধ্যায়	দোআ ও মুনাজাত	১৬৫
২য় অধ্যায়	অসচ্চরিত্র	১৫৫			

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম ভাগ
আল আকাইদ
اَلْعَقَائِدُ

প্রথম অধ্যায়
আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

প্রথমপাঠ
সহিহ আকিদার পরিচয়

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلَّذِى عَلَّمَنَا الدِّيْنَ عَلٰى لِسَانِ النَّبِيِّ الأَمِيْنِ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِنَا الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

আকাইদের পরিচয়

আকিদা (عَقِيْدَة) শব্দটি عَقْد মূল ধাতু থেকে এসেছে। শব্দটির অর্থ বন্ধন ও বিশ্বাস। আকিদা (عَقِيْدَة) শব্দটি একবচন। বহুবচনে আকাইদ (عَقَائِد)। যে দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা, চেতনা পরিচালিত হয় এবং কর্মসমূহ সম্পাদনের পথ ও পদ্ধতি বৈধতা লাভ করে, তারই নাম আকিদা।

সহিহ আকিদার পরিচয়

শরিয়তের পরিভাষায় সহিহ আকিদার পরিচয় হলো –

مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَالضَّمِيْرُ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ وَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالٰى.

অর্থ : তাওহিদ, রিসালাত ও প্রিয় রাসুল (ﷺ) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার নামই আকিদা।

আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো চিন্তা, দর্শন, কর্ম যথার্থ ও ফলপ্রসূ হয় না। আমলকে যদি দেহ ধরা হয়, আকিদা এর প্রাণ। দেহ যেভাবে প্রাণ ছাড়া অকার্যকর তেমনি সহিহ আকিদা ছাড়া আমলও অকার্যকর। তাই ইসলামি শরিয়তে আকিদা বিষয়ে সহিহ ইলম অর্জন করা ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার ذَات (যাত) বা সত্তা, صِفَات (সিফাত) বা গুণাবলি, حُقُـوْق (হুকুক) বা আইনগত অধিকার, اِلٰــه (ইলাহ) বা ইবাদত ও সম্মান পাওয়ার একমাত্র হকদার হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট চিন্তা-দর্শন না থাকলে সহিহ আকিদা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না।

(مَالِك) বা অধিকর্তা, (رَبّ) বা পালনকর্তা, (اِلٰــه) বা ইবাদতের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তাঁর প্রেরিত ও মনোনীত নবি ও রাসুলগণ তাঁরই দ্বীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। আকিদার মূল বিষয় হলো আল্লাহ তাআলার গুণাবলিসহ তাঁর সত্তা, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, সকল নবি ও রাসুল, পরকালীন জীবন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভালো-মন্দ তকদিরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং এসব সঠিকভাবে উপলব্ধি করা ইলমুল আকাইদ-এর মূল বিষয়।

এক আল্লাহকে ও তাঁর প্রিয় রাসুল (ﷺ)-কে মানার মাঝে যে সকল শান্তি নিহিত তা দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে উপলব্ধি করা, মনে স্থান দেওয়াই ইমানের মূল চেতনা। আকিদা সহিহ না হলে বান্দার কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় পাঠ

ভ্রান্ত আকিদার কুফল

সহিহ বা বিশুদ্ধ আকিদা নেক আমল কবুলের পূর্বশর্ত। উপরে উল্লিখিত সহিহ আকিদাসমূহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি পরিপন্থী কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস করা ভ্রান্ত আকিদা। আকিদা সহিহ না করে একজন লোক যদি সারা জীবন সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়; তা কবুল হবে না, তার সব আমলই নিষ্ফল হবে। যেমন, কাদিয়ানি সম্প্রদায় সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে, হজ্জ করে, আযান দেয়, মসজিদ তৈরি করে কিন্তু তারা মুহাম্মদ (ﷺ) কে শেষনবি মানে না। তারা মনে করে তাদের ধর্মের প্রবর্তক গোলাম আহমদ কাদিয়ানিই শেষনবি। এই একটি ভ্রান্ত আকিদার ফলে তারা যে মুসলমানদের দলভুক্ত নন, এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্বের আলেম সমাজ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।

অনুরূপভাবে যারা প্রিয় রাসুল (ﷺ)-কে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ মনে করে, অতি মানব (মানবসত্ত্বার বাইরের কিছু) মনে করে, প্রিয় রাসুল (ﷺ) মরে মাটিতে মিশে গেছেন ইত্যাদি ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে তাদের কোনো আমলই কবুল হবে না। আবার কাউকে আল্লাহর সমতুল্য বা সমগুণসম্পন্ন ও সমশক্তিধর মনে করা সবচেয়ে বড় জুলুম। এ ধরনের কাজ শিরক, আল্লাহর সাথে শিরক করা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই শিরক করা চরম জুলুম। (সূরা লোকমান, ১৩)

হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা এবং রসুল (ﷺ)-এর সুন্নতকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা কুফরী। তাই বলা হয়– إِهَانَةُ الرَّسُوْلِ كُفْرٌ

অর্থ : রাসুল (ﷺ)-কে অবজ্ঞা করা, তার শান ও মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করা কুফরী।

প্রিয় রাসুল (ﷺ) এর শানে বেআদবি করলে সকল আমল বরবাদ হয়ে হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। (সূরা হুজুরাত, ২)

এককথায়, সহিহ আমল এবং আমলের ফলাফল পেতে হলে সহিহ আকিদা অবশ্যই চাই। শিরক, কুফর ও নিফাক মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। সহিহ আকিদা নিয়ে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. আকিদা বিষয়ে সহিহ্ ইলম অর্জন করার বিধান কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. সবচেয়ে বড় জুলুম কোনটি?

ক. শিরক খ. কুফর

গ. নিফাক ঘ. বিদআত

৩. ইলমুল আকাইদের কাজ হচ্ছে-

i. আল্লাহর যাত ও সেফাত জানা

ii. ইমানের শাখাসমূহ দৃঢ় বিশ্বাস করা

iii. নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. আকিদা শব্দটির অর্থ কী?

ক. বন্ধন ও বিশ্বাস খ. নীতি-নৈতিকতা

গ. শৃঙ্খলা ও নীতিমালা ঘ. সততা ও শুদ্ধাচার

৫. عَقِيْدَة শব্দটির বহুবচন কী?

ক. العقائدون খ. عقايد

গ. عقيدات ঘ. عَقَائِـد

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. আকিদা শব্দের আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কী? মুমিনের জীবনে বিশুদ্ধ আকিদার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

২. শিরক কী? দলীলসহ বর্ণনা করো।

৩. আমল কবুলের পূর্বশর্তগুলো কী কী? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আদ দীন
اَلـدِّيْـنُ

প্রথম পাঠ
দীনের পরিচয় ও মৌলিক দিক

দ্বীনের পরিচয়

দ্বীন (اَلدِّيْن) শব্দের অর্থ আনুগত্য, শক্তি, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বন্দেগি, দাসত্ব, নিয়ম-নীতি, হিসাব-নিকাশ, ফয়সালা, জীবনব্যবস্থা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন (জীবনব্যবস্থা)।

(সূরা আলে ইমরান, ১৯)

সুতরাং যে জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি, শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তাকেই দ্বীন ইসলাম বলে।

দ্বীনের মৌলিক দিক

দৃঢ় বিশ্বাসই হলো দ্বীনের মূলভিত্তি। দ্বীন হলো আল্লাহ ও তাঁর মাখলুকের মাঝে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। জিবরীল (ﷺ) আদব ও তা'যিমের সাথে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে ছাত্রের মতো বসে রাসুল (ﷺ)-কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দ্বীনের মৌলিক দিকগুলো বর্ণনা করেন। প্রশ্নোত্তর সংবলিত এ হাদিসকে 'হাদিসে জিবরীল' বলা হয়। এ হাদিসের মাধ্যমে দ্বীনের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা তিনটি বিষয়ের সমন্বিত ও সমষ্টিগত রূপ। তা হলো–

(ক) আল ইমান (اَلْإِيْمَان) ; (খ) আল ইসলাম (اَلْإِسْلَام) ও (গ) আল ইহসান (اَلْإِحْسَان)

ইসলামের বাহিরে গ্রহণযোগ্য কোনো দ্বীন নেই। কেউ দাবি করলেও তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে, তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আলে ইমরান, ৮৫)

দ্বিতীয় পাঠ

ইমানের শাখাসমূহ

ইমান হলো বিশ্বাসের নাম। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন এবং দিয়েছেন, তার ওপর পূর্ণ বিশ্বাসকেই ইমান বলা হয়। ইমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। এ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

অর্থ: ইমানের শাখা হচ্ছে সত্তরের অধিক বা ষাটের অধিক। এর মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই- একথার সাক্ষ্য দেওয়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ইমানের অন্যতম শাখা। (সহিহ মুসলিম-৫৯)

ইমান পবিত্র বৃক্ষ। যার শাখা-প্রশাখা সত্তরের অধিক। এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য ২০টি শাখা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। আল্লাহর যাত, সিফাত ও তাওহিদের উপর বিশ্বাস;

২। আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই নশ্বর এ বিশ্বাস রাখা;

৩। ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা;

৪। আসমানি কিতাবসমূহ সত্য এ বিশ্বাস রাখা;

৫। রসুল (ﷺ) গণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন;

৬। তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস;

৭। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস। (মুনকার নাকিরের সাওয়াল জওয়াব, কবরের আযাব, পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়া, হিসাব, মিযান, পুলসিরাত ইত্যাদি) ;

৮। জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ও তাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকার বিশ্বাস রাখা ;

৯। জাহান্নামের ভয় ও আযাব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ;

১০। আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত পোষণ করা ;

১১। আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা (মুহাজির, আনসার ও রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধরগণের প্রতি ভালোবাসা পোষণ) এবং আল্লাহর জন্যই কারো প্রতি ঘৃণা পোষণ করা;

১২। রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ ও তাঁর সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমে সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসা রাখা ;

১৩। কাজে কর্মে লোক দেখানো ও কপটতামুক্ত ইখলাস বা নিষ্ঠা প্রদর্শন ;

১৪। তওবা ও অনুশোচনা ;

১৫। খাওফ বা ভবিষ্যত পরিণতির বিষয়ে ভয় করা ;

১৬। আশান্বিত থাকা ;

১৭। হতাশা ও নিরাশা ত্যাগ করা ;

১৮। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা ;

১৯। বিশ্বস্ত হওয়া এবং

২০। সবর বা সহনশীলতার গুণ অর্জন করা।

তৃতীয় পাঠ
তাযকিয়ার পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

তাযকিয়া (تَزْكِيَة) শব্দের অর্থ পবিত্রকরণ, পরিশুদ্ধ করা। যে জ্ঞান অর্জন ও তদানুযায়ী আমল করলে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক পূত-পবিত্র হয়ে আলাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা, তাকে ইলমুত তাযকিয়া (عِلْمُ التَّزْكِيَة) বলে। কুরআন মাজিদের ২৯টি আয়াতে তাযকিয়ার কথা বলা হয়েছে।

তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধি হতে হবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের। তার সূচনা হবে ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধি থেকে। রসুল (ﷺ) এর প্রধান চারটি দায়িত্বের মধ্যে তাযকিয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

যেমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের থেকেই একজন রাসুল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমন সব কথা তোমাদের শেখায়, যা তোমরা জানতে না।
(সূরা বাকারাহ, ১৫১)

তিলাওয়াতে আয়াত, তাযকিয়া, তালিমুল কিতাব ও তালিমুল হিকমা-এ চারটি বিষয়ের কোনো একটি বাদ দিলে রাসুল (ﷺ)-কে মানা হয় না। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ যেভাবে শিক্ষা করা ও আমল করা ফরযে আইন, একইভাবে ইলমুত্ তাযকিয়ার জ্ঞান অর্জন করা এবং আমলে পরিণত করাও ফরয।

মানুষের শারীরিক রোগ চিকিৎসার জন্য যেভাবে ডাক্তার প্রয়োজন, তদ্রূপ আত্মিক রোগের জন্য গ্রহণযোগ্য আলেমগণের পরামর্শ প্রয়োজন। যিনি আল্লাহ, রাসুলের (ﷺ) নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাযকিয়ার জ্ঞান দান করবেন। আল্লাহ তাআলা তাযকিয়া অর্জনকারীদের সফলকাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

অর্থ : নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তাঁর প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে। (সূরা আলা, ১৪-১৫)

আল্লাহ তাআলা প্রথমত তাযকিয়া বা নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, দ্বিতীয়ত রাসুলের নির্দেশিত পদ্ধতিতে আল্লাহর যিকির করা এবং তৃতীয় পর্যায়ে সালাত আদায় করার কথা বলেছেন। তাই আত্মিক পরিশুদ্ধি, সুন্নাহ মোতাবেক যিকির ও সালাত আদায়, এ তিনটি কাজই একজন মুমিনের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. ইমানের অন্যতম শাখা কোনটি?

ক. পবিত্রতা খ. লজ্জা

গ. পরোপকার ঘ. সৃজনশীলতা

২. تَزْكِيَةٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. পরিশুদ্ধ করা খ. তাসাওফ অর্জন করা

গ. নৈকট্য লাভ করা ঘ. বিশ্বাস করা

৩. দ্বীন ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যা দ্বারা মানুষ–

i. ইহ ও পরকালীন মুক্তি লাভ করে

ii. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে

iii. অনেক ধন-সম্পত্তি লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. اَلـدِّيْـنُ শব্দের অর্থ কী?

ক. আনুগত্য খ. জ্ঞান

গ. প্রজ্ঞা ঘ. পবিত্রতা

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. "اَلدِّيْن" এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা লেখ। দ্বীনের মৌলিক দিক কয়টি ও কী কী বর্ণনা করো।

২. "اَلْإِيْمَان" কী? এর কয়টি শাখা-প্রশাখা রয়েছে? উল্লেখযোগ্য শাখাগুলো লেখ।

৩. "تَزْكِيَة" কী? তাযকিয়ার পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহর প্রতি ইমান
اَلْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ

প্রথম পাঠ
পবিত্র কুরআনের আলোকে আল্লাহর প্রতি ইমান

ইমান (اَلْإِيْمَان) ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রথম ও প্রধান বুনিয়াদ। এর অর্থ অন্তরের বিশ্বাস, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা, স্বীকার করা, ভরসা করা ইত্যাদি। কুরআন মাজিদে বিভিন্ন আঙ্গিকে অসংখ্য বার ইমান প্রসঙ্গ এসেছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমান হলো–

تَصْدِيْقُ النَّبِـيِّ ﷺ ذَاتًا وَ صِفَةً وَبِمَا جَاءَ بِهِ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ)-এর সত্তা, গুণাবলি এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এ সবকিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

অর্থ : রাসুল, তাঁর প্রতি প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তাদের সবাই আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাগণের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছেন। (সূরা বাকারা, ২৮৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

অর্থ : যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। (সূরা বাকারা, ৬২)।

ইমানের বিপরীতে কুফরির পরিণাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْـخَاسِرِينَ.

অর্থ : যে ইমানকে অস্বীকার করবে, তার যাবতীয় আমল নিষ্ফল ও পরিশেষে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা মায়িদা, ৫)

দ্বিতীয় পাঠ
সুন্নাহর দৃষ্টিতে ইমান

প্রিয় রাসুল(ﷺ)কে মনে-প্রাণে মুহাব্বতের সাথে মানলে হয় মুমিন আর অস্বীকার করলে হয় কাফের। মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলে, সে হয় মুনাফিক। ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন– রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন–

أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ؟

অর্থ : তোমরা কি জানো আল্লাহর প্রতি ইমান কী?

জবাবে তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তার রাসুল (ﷺ) ভালো জানেন।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জবাবে বলেন– شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

অর্থ: (আল্লাহর প্রতি ইমান এই যে) সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ(উপাস্য) নেই আর মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল। (সহিহ বুখারি, ৫১)

অন্য হাদিসে আছে, জিবরীল (عليه السلام) রাসুল (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলেন–

يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِيمَانُ؟

অর্থ : হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! ইমান বলতে কী বোঝায়?

জবাবে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেন–

(اَلْإِيْمَانُ) أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

অর্থ: (ইমান হলো) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রাসুলগণ ও পরকালের প্রতি এবং বিশ্বাস করবে ভালো-মন্দ তাকদিরের প্রতি। (সহিহ মুসলিম-১)

অন্য হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ(ﷺ)-কে প্রশ্ন করা হলো– أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ অর্থ : কোন আমল সর্বোত্তম? জবাবে বলেন– اَلْإِيمَانُ بِاللهِ অর্থ : আল্লাহর উপর ইমান আনা। (সহিহ মুসলিম, ৮৩)

হাদিসের আলোকে ইমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। যার সর্বোচ্চ শাখা হলো–

لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

আর সর্বনিম্ন শাখা হলো– إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

অর্থ : যে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া। (সহিহ মুসলিম, ৫৯)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রধান বুনিয়াদ কোনটি?

ক. ইমান খ. সালাত

গ. যাকাত ঘ. সাওম

২. اَلْإِيْمَانُ (ইমান) অর্থ কী?

ক. বিশ্বাস খ. দৃঢ়তা

গ.বন্ধন ঘ. নিরাপত্তা

৩. শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমান হল–

i. আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বিশ্বাস করা

ii. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনীত বিষয়গুলো বিশ্বাস করা

iii. পারস্পরিক সহযোগিতা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. "الملائكة" শব্দের অর্থ কী?

ক. অলিগণ খ. বন্ধুগণ

গ. ভৃত্যগণ ঘ. ফেরেশতাগণ

৫. সর্বোত্তম আমল কোনটি?

ক. আল্লাহর উপর ইমান আনা খ. সালাত আদায় করা

গ. সিয়াম পালন করা ঘ. যিক্‌র করা

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. ইমান বলতে কী বোঝায়? দলিলসহ বর্ণনা কর।

২. ইমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোনিম্ন শাখা কী? সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করো।

চতুর্থ অধ্যায়
আত তাওহিদ
اَلتَّوْحِيْد

প্রথম পাঠ
তাওহিদের স্তরসমূহ
مَرَاتِبُ التَّوْحِيْدِ

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْد) শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর অর্থ হলো একীকরণ বা একত্ববাদ। আল্লাহ তাআলা একক, তাঁর কোনো শরিক নেই- এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকেই তাওহিদ বলে। তাওহিদের তিনটি প্রকার বা স্তর রয়েছে। তা হলো-

(ক) তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ (تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ)
(খ) তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ (تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ)
(গ) তাওহিদুয যাত ওয়াস-সিফাত (تَوْحِيْدُ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ)

(ক) তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ (تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ)

আল্লাহ তাআলা একমাত্র স্রষ্টা (خَالِق), মালিক (مَالِك), রিযিকদাতা (رَزَّاق) ও বিধানদাতা (حَاكِم)। তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক, সবকিছুর পালনকর্তা, সব কিছুর সার্বভৌম অধিকার তাঁরই- একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকার না করা। সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বাস মনে-প্রাণে ধারণ করা। এ প্রকার তাওহিদকে 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ' বলা হয়।

(খ) তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ (تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ)

একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে ইবাদাতের হকদার মনে করা। ইলাহ বা উপাস্য হিসেবে, মাবুদ হিসেবে, একমাত্র আল্লাহকে মেনে নেওয়া। সালাত, যাকাত, হজ্জ, কুরবানি, যবেহ, মান্নত-সহ যাবতীয় ইবাদত কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা। এককথায়, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করাকে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ বলা হয়। এ প্রকার তাওহিদের আরেক নাম 'তাওহিদুল ইবাদাহ' (تَوْحِيْدُ الْعِبَادَةِ)।

এ তাওহিদের কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)

(গ) তাওহিদুয যাত ওয়াস-সিফাত (تَوْحِيْدُ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ)

আল্লাহ তাআলা সত্তাগত ও গুণগত দিক থেকে এক ও অদ্বিতীয়। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। আল্লাহ তাআলার রয়েছে অনেকগুলো গুণবাচক নাম। তিনি এসব গুণের চূড়ান্ত ও শাশ্বত অধিকারী। যেমন- আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন চিরঞ্জীব (اَلْحَيُّ), চিরস্থায়ী (اَلْقَيُّوْمُ), জীবনদাতা (اَلْمُحْيِيْ), মৃত্যুদাতা (اَلْمُمِيْتُ) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পাঠ
আল আসমাউল হুসনা
اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

আল আসমাউল হুসনার পরিচয়

আল আসমাউল হুসনা (اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى)-এর অর্থ হলো সুন্দর নামসমূহ। আল্লাহ (اَللّٰه) হচ্ছে اِسْمُ ذَاتٍ বা সত্তাগত নাম। এ মহান সত্তার প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে হলে, তাকে চিনতে হলে, তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে, তাঁর গুণাবলি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হবে। আল্লাহ তাআলার সত্তা যেমন সুমহান, অসীম ও অবিনশ্বর, তাঁর صِفَات বা গুণাবলি এবং ক্ষমতাও অসীম, অবিনশ্বর। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। ঐ সকল নাম দ্বারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলি প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাকে যে সকল গুণবাচক নাম দিয়ে ডাকা হয় সেগুলোকে اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (আল আসমাউল হুসনা) বলে।

আল আসমাউল হুসনার গুরুত্ব

মানুষের জীবনে আল আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। এ সকল গুণাবাচক নাম দ্বারা আমরা আল্লাহকে চিনতে পারি। মূলকথা হচ্ছে, সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহ তাআলা যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনিভাবে গুণাবলি ও সিফাতের ক্ষেত্রেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এ সমস্ত গুণে তাঁর কোনো শরিক এবং সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর গুণ নিরঙ্কুশ ও অসীম।

এসব গুণবাচক নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

অর্থ : আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাকে সে সকল নামেই ডাকবে।
(সূরা আরাফ, ১৮০)

আসমাউল হুসনা দ্বারা আল্লাহকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেবেন এবং তিনি জান্নাত দান করবেন। এ সম্পর্কে হাদিসে নববিতে উল্লেখ আছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْـجَنَّةَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (﵁) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– আল্লাহ্ তাআলার ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহিহ বুখারি, ৬৪১০)

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (﵁) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

কারো কোনো বিপদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি উপস্থিত হলে, সে আসমাউল হুসনা পাঠ করে দোআ করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিপদ দূর করে শান্তি দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ তাআলার কতিপয় গুণবাচক নাম

(১) আল আহাদু اَلْأَحَدُ (এক)

(২) আস সামাদু اَلصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত)

(৩) আল আউয়ালু اَلْأَوَّلُ (আদি)

(৪) আল আখেরু اَلْاٰخِرُ (অন্ত)

(৫) আল লাতিফু اَللَّطِيْفُ (অনুগ্রহশীল)

(৬) আল হাইয়্যু اَلْحَيُّ (চিরঞ্জীব)

(৭) আল কাইয়্যুমু اَلْقَيُّوْمُ (চিরস্থায়ী) ইত্যাদি।

(৮) আল খালেকু اَلْخَالِقُ (স্রষ্টা)

(৯) আল মুবদিউ اَلْمُبْدِئُ (অনুকরণ ছাড়াই স্রষ্টা)

(১০) আল মুইদু اَلْمُعِيْدُ (পুনর্জীবন দানকারী)

(১১) আল বাদীউ اَلْبَدِيْعُ (নমুনা ছাড়াই সৃজনকারী) ইত্যাদি।

(১২) আর রহমানু اَلرَّحْمٰنُ (পরম করুণাময়)

(১৩) আর রহীমু اَلرَّحِيْمُ (অসীম দয়ালু)

(১৪) আল গাফুরু اَلْغَفُوْرُ (পরম ক্ষমাশীল)

(১৫) আর রউফু اَلرَّءُوْفُ (স্নেহশীল)

(১৬) আল ওয়াদূদু اَلْوَدُوْدُ (প্রেমময়) ইত্যাদি।

(১৭) আল আযিমু اَلْعَظِيْمُ (সুমহান)

(১৮) আল আযিযু اَلْعَزِيْزُ (মহাক্ষমতাবান)

(১৯) আল মাজিদু اَلْمَجِيْدُ (মহাসম্মানী)

(২০) যুল-জালালি ওয়াল ইকরাম ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (গৌরব ও সম্মানের অধিকারী)

(২১) আল আলিয়্যু اَلْعَلِـىُّ (সুমহান)

(২২) আল মুতাকাব্বিরু اَلْمُتَكَبِّرُ (অতীব মহিমান্বিত) ইত্যাদি।

(২৩) আল বাসিরু اَلْبَصِيْرُ (সর্বদ্রষ্টা)

(২৪) আস সামিউ اَلسَّمِيْعُ (সর্বশ্রোতা)

(২৫) আল খাবিরু اَلْـخَبِيْرُ (সম্যক অবহিত)

(২৬) আশ শাহিদু اَلشَّهِيْدُ (প্রত্যক্ষ কারী)

(২৭) আল হাকিমু اَلْـحَكِيْمُ (মহাপ্রজ্ঞাবান) ইত্যাদি।

(২৮) আল কাদিরু اَلْقَدِيْرُ (সর্ব শক্তিমান)

(২৯) আল মুকতাদিরু اَلْمُقْتَدِرُ (প্রবল)

(৩০) আল জাব্বারু اَلْـجَبَّارُ (মহাপরাক্রমশালী) ইত্যাদি।

(৩১) আল মালেকু اَلْمَالِكُ (অধিকর্তা)

(৩২) আল হাফিযু اَلْحَفِيْظُ (রক্ষাকর্তা)

(৩৩) আর রাব্বু اَلرَّبُّ (প্রতিপালক)

(৩৪) আল হাসিবু اَلْحَسِيْبُ (হিসাব রক্ষক)

(৩৫) আল ওয়াকিলু اَلْوَكِيْلُ (কর্মবিধায়ক)

(৩৬) আল আদলু اَلْعَدْلُ (সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারক) ইত্যাদি।

এছাড়া আরো যে সকল গুণবাচক নাম রয়েছে সেগুলো আল্লাহ পাকের কোনো না কোনো প্রকার গুণের প্রকাশ করে।

তৃতীয় পাঠ
আল্লাহর ইবাদত
عِبَادَةُ اللّٰهِ

ইবাদতের পরিচয়

ইবাদত (اَلْعِبَادَة) শব্দটি একবচন। বহুবচনে اَلْعِبَادَات ; শব্দটি عَبْـد থেকে নির্গত। عَبْـدٌ অর্থ চরম বিনয়ের সাথে অনুগত হওয়া দাস বা বান্দা। اَلْعِبَادَة শব্দের অর্থ হলো–

اَلتَّذَلُّـل বা চূড়ান্ত বিনম্রতা ও দাসত্ব।

ইসলামের পরিভাষায় ইবাদত হলো–

اَلْعِبَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَ الْـخُضُوْعِ وَالْـخَوْفِ

অর্থ: পরিপূর্ণ মুহাব্বত, বিনয় ও ভয়ের সাথে আনুগত্য করার নাম ইবাদত।

পূর্ণাঙ্গ মুহাব্বত, সর্বোচ্চ বিনয় ও পরম ভয়ের সাথে আল্লাহর প্রতি পরম সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশকে আল্লাহর ইবাদত বলা হয়।

ইবাদতে বিনয়ের অভিব্যক্তি হবে স্বেচ্ছায় ও নিষ্ঠার সাথে। এই সম্মান ও বিনয় অনিচ্ছায়, অন্যের শক্তি প্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে করলে তা ইবাদত হবে না। ইবাদতের যোগ্য এমন এক মহান সত্ত্বা যিনি পরম সম্মানের অধিকারী, জীবন ও জীবিকার মালিক, যার উপরে ক্ষমতাবান ও দয়াবান আর কেউ নেই। নিঃসন্দেহে তিনি মহান আল্লাহ তাআলা। সবকিছুর মালিকানা যেহেতু তাঁর, তাই ইবাদতেরও একমাত্র মালিক তিনিই।

মানবজাতির প্রতি ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে মানুষ! ইবাদত করো তোমাদের রবের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। (সূরা বাকারা, ২১)

আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা জায়েয নয়। আর কেউ ইবাদতের যোগ্যও নয়। সকল নবি-রাসুল উম্মতকে একই দাওয়াত দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ বলেন–

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰـهٍ غَيْرُهُ

অর্থ : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। (সূরা আরাফ, ৭৩)

সুরা ফাতিহায় উল্লেখ আছে– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

অর্থ : আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

এ ঘোষণা প্রতিনিয়ত আমরা দিয়ে যাই। কেননা শিরকমুক্ত ও নিষ্ঠাযুক্ত ইবাদত ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোনো ইবাদত কবুল হয় না।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদত তথা দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থ: আমি তো জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত-৫৬)
মানুষ তার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলবে- এটাই ইবাদতের মূল কথা।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. تَوْحِيْدُ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ অর্থ কী?

ক. স্বত্ত্বাগত ও গুণগত এককত্ব
খ. গুণগত এককত্ব
গ. আইনগত এককত্ব
ঘ. ইবাদতগত এককত্ব

২. لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ কালিমাটি কোন তাওহিদের অন্তর্ভুক্ত?

ক. تَوْحِيْدُ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ
খ. تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ
গ. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ
ঘ. تَوْحِيْدُ الْوَحْدَانِيَّةِ

৩. আল্লাহ তাআলার اَلرَّحْمٰن নামটি কী বিষয়ক?

ক. সৃষ্টি
খ. দয়া
গ. গৌরব
ঘ. ক্ষমতা

৪. اَلْعِبَادَة শব্দটি কোন শব্দ থেকে নির্গত?

ক. عَبْد
খ. عُبُوْد
গ. عِبَاد
ঘ. عُبَيْد

৫. تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّةِ বলতে বোঝায়–

i. একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা
ii. আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মানত না করা
iii. একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কুরবানি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

৬. আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ববিষয়ক নাম হচ্ছে-

i. اَلْعَظِيْم

ii. اَلرَّحْمٰن

iii. اَلْعَزِيْز

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৭. "التوحيد" শব্দের অর্থ কী?

ক. একত্ববাদ খ. কর্তৃত্ববাদ

গ. সাম্যবাদ ঘ. মৌলবাদ

৮. "الخالق" শব্দের অর্থ কী?

ক. নমুনা ছাড়াই সৃজনকারী খ. স্রষ্টা

গ. সংস্কারক ঘ. নির্মাতা

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. "التوحيد" এর সংজ্ঞা দাও। তাওহিদের স্তর কয়টি ও কী কী? বর্ণনা করো।

২. اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى বলতে কী বুঝ? আল আসমাউল হুসনার গুরুত্ব আলোচনা করো।

৩. ইবাদত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ইবাদতের বর্ণনা দাও।

৪. تَوْحِيْدُ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লিখ।

৫. تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ ও تَوْحِيْدُ الأُلُوْهِيَّةِ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِالـرُّسُلِ

প্রথম পাঠ

আল কুরআনে বর্ণিত নবি ও রাসুল

নবি ও রাসুলের পরিচয়

নবি ও রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত বা বার্তাবাহক। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট নবি ও রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন। যিনি নতুন শরিয়তসহ প্রেরিত হয়েছেন তাকে রাসুল বলে। আর যিনি পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত অনুযায়ী দ্বীন প্রচার করেছেন তাকে নবি বলা হয়।

আল কুরআনে ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়নি এমন অনেক নবি ও রাসুল রয়েছেন। আমরা তাঁদের অনেকের নাম জানি আবার অনেকের নাম জানি না। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মহানবি (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন–

وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ.

অর্থ: অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আমি পূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসুল যাদের কথা আপনাকে বলিনি (সূরা নিসা, ১৬৪)।

কুরআন মাজিদে ২৫ জন নবি-রাসুল (عليهم السلام)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন–

১. আদম (عليه السلام)
২. ইদরিস (عليه السلام)
৩. নূহ (عليه السلام)
৪. ইবরাহিম (عليه السلام)
৫. লুত (عليه السلام)
৬. ইসমাইল (عليه السلام)

৭. ইসহাক (আ:)

৮. ইয়াকুব (আ:)

৯. ইউসুফ (আ:)

১০. শোয়াইব (আ:)

১১. মুসা (আ:)

১২. হারুন (আ:)

১৩. আইয়ুব (আ:)

১৪. দাউদ (আ:)

১৫. সুলায়মান (আ:)

১৬. ইউনুস (আ:)

১৭. ইলিয়াস (আ:)

১৮. যাকারিয়া (আ:)

১৯. ইয়াহ্ইয়া (আ:)

২০. হুদ (আ:)

২১. সালেহ (আ:)

২২. যুলকিফল (আ:)

২৩. আল ইয়াসা (আ:)

২৪. ইসা (আ:)

২৫. মুহাম্মদ (ﷺ)

উল্লেখ্য যে, ওজায়ের (আ:) এর নবি হওয়ার বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সকল নবি ও রাসুলের দ্বীন ছিলো ইসলাম। তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেওয়াই ছিলো তাঁদের মূল কাজ।

দ্বিতীয় পাঠ

নবি ও রাসুলগণের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য

নবি ও রাসুল(ﷺ) গণের ব্যাপারে আমাদের এ আকিদা থাকতে হবে যে, তাঁরা সর্বযুগেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। শারীরিক গঠনে, বংশ পরিচয়ে, আচার-আচরণে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাঁরা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তারা ছিলেন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। নবি ও রাসুল(ﷺ)গণ ছিলেন মাসুম مَعْصُوْمٌ বা নিষ্পাপ। তাঁদের সামান্যতম গুনাহ ছিলো এ ধারণা বা আকিদা পোষণ করা ইমান পরিপন্থি। তারা ছিলেন সমাজের, দেশের ও জাতির ইমাম বা প্রধান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ.

অর্থ : এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো; তাদেরকে ওহি প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদত করতো। (সূরা আম্বিয়া, ৭৩)।

নবি ও রাসুল(ﷺ)গণ মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শবান ব্যক্তি। তাঁরা নবুওয়াত লাভের পূর্বে বা পরে সর্বাবস্থায় কুফরি ও শিরকসহ ছোট-বড় সর্বপ্রকার গুণাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। এ পবিত্রতা তাঁদের পৃথিবীতে আগমন থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, নবুওয়াত ও রিসালাতের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে ছিলো। তাঁরা নবুওয়াত ও রিসালাত লাভের পূর্বেও ছিলেন মা'সুম বা নিষ্পাপ এবং নবুওয়াত ও রিসালাত লাভের পরেও নিষ্পাপ এ আকিদা মন মানসিকতায় পোষণ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁদের ক্ষমা চাওয়া বা মাফ চাওয়া সবই ছিলো উম্মতের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের বিনয় প্রকাশের জন্যে।

নবি ও রাসুলগণের প্রতি ইমানের দাবি

১। নবি ও রাসুলগণকে জীবনের সকল পর্যায়ে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে মানতে হবে। তাঁদের আনুগত্যই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। আল্লাহ বলেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.

অর্থ : কেউ রাসুলের আনুগত্য করলে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো। (সূরা নিসা, ৮০)

২। রাসুলগণের আনীত হেদায়েতই একমাত্র গ্রহণযোগ্য, সর্বাধুনিক ও সর্বজনীন। একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সে হিদায়াত মোতাবেক জীবন গঠন করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন–

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ.

অর্থ : ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা অন্বেষণ করলে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আলে ইমরান, ৮৫)

৩। নবি ও রাসুল (ﷺ)গণকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে। তাঁদের নাম আদবের সাথে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন : যখন কোন নবির নাম উচ্চারণ করা হবে তখন বলতে হবে আলাইহিস সালাম, যার সংক্ষিপ্তরূপ (ﷺ) যেমন: হযরত আদম (ﷺ), হযরত ইব্রাহিম (ﷺ)। বলতে হবে নবি করিম (ﷺ) বলেন বা ইরশাদ করেন, হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন ইত্যাদি।

নবি ও রাসুলগণের মর্যাদার খেলাফ কোনো কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকাও ইমানের দাবি।

তৃতীয় পাঠ
রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি

রসুলুল্লাহ (ﷺ) সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

অর্থ : আমি আপনাকে সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া, ১০৭)

অন্যান্য নবি ও রসুল (ﷺ) নির্দিষ্ট একটি এলাকার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবি (ﷺ) সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা সাবা, ২৮)

মুহাম্মদ (ﷺ) হচ্ছেন সর্বশেষ নবি ও রাসুল। মহান আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

অর্থ: মুহাম্মাদ (ﷺ) তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষনবি। (সূরা আহযাব-৪০)

রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

অর্থ: আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সরদার হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর খুলে যাবে এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি। (সহিহ মুসলিম-২২৭৮)

মহানবি (ﷺ)-এর মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করার পরিণাম

সকল নবি-রাসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইমানের অঙ্গ। আর মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ নবি হওয়ার কারণে তাঁকে সম্মান করতে হবে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। কোনো কথায় বা কাজে তাঁর সাথে সামান্যতম বেয়াদবি ইমানবিধ্বংসী ও কুফরি। যে সকল শব্দ দ্বারা সাধারণ কাউকে তুচ্ছ ও হেয় করা হয় সে সকল শব্দ তাঁর সম্পর্কে বলা বা লেখা সম্পূর্ণ ইমান পরিপন্থি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. পবিত্র কুরআনে কতজন নবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

ক. ২২ খ. ২৫

গ. ২৬ ঘ. ২৮

২. আল্লাহ কাকে সৃষ্টি জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন?

ক. নূহ (ﷺ) খ. মুসা (ﷺ)

গ. ইসা (ﷺ) ঘ. মুহাম্মদ (ﷺ)

৩. নবি-রসুলগণ হচ্ছেন -

i. সর্বোত্তম আদর্শবান ব্যক্তি

ii. আল্লাহর প্রকৃত বান্দা

iii. সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪. "نبی" শব্দের অর্থ কী?

ক. বন্ধু খ. শিক্ষক

গ. বার্তাবাহক ঘ. সংস্কারক

৫. "معصوم" শব্দের অর্থ কী?

ক. নিষ্পাপ খ. প্রশংসিত

গ. মহান ঘ. মর্যাদাবান

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. নবি ও রাসুলের পরিচয় দাও। আল কুরআনে বর্ণিত নবি ও রাসুল (ﷺ)-এর সংখ্যা কত? উল্লেখযোগ্য ১০ জন নবি-রাসুলের নাম লেখ।

২. নবি ও রাসুলগণের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য কী? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো।

৩. "রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ **নবি**" কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ

প্রথম পাঠ

আল কুরআনে বর্ণিত ফেরেশতাগণের কার্যক্রম

(ক) আল্লাহর হুকুম মানা ও তাসবিহ পাঠ

ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি। তারা মানবীয় দুর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা বাসনা বা পাপেচ্ছা ও পানাহার থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহর গুণগান করেন এবং তার নির্দেশ পালন করেন। ফেরেশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ، لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

অর্থ : তাঁরা তো তার সম্মানিত বান্দা। তাঁরা আগে বেড়ে কথা বলে না; তাঁরা তো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকেন। (সূরা আম্বিয়া, ২৬-২৭)

অন্যত্র আল্লাহ পাক তাঁদের বিষয়ে বলেন–

لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থ: আল্লাহ তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেন তা তাঁরা লঙ্ঘন করেন না এবং তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা তাঁরা পালন করেন। (সূরা তাহরিম, ৬)

(খ) আল্লাহর প্রিয় হাবিবের উপর দরুদ পড়া

ফেরেশতাদের সার্বক্ষণিক একটি দায়িত্ব হলো আল্লাহর প্রিয় হাবিবের উপর দরুদ পড়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ নবির প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তার ফেরেশতাগণও নবির জন্য রহমতের দোআ করেন। (সূরা আহযাব, ৫৬)

(গ) কর্ম নির্বাহ ও কর্ম বণ্টন করা

সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত, তাসবিহ ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ছাড়াও ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। মহান আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তাঁদেরকে দায়িত্ব দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ، فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا ، يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ.

অর্থ: শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে। এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেয়। এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে। আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। সেদিন প্রথম সিঙ্গাধ্বনি প্রকম্পিত করবে। (সূরা নাযিয়াত, ১-৬)

(ঘ) ওহি পৌঁছানো

ফেরেশতাদের একটি মৌলিক দায়িত্ব হলো, নবি ও রাসুলগণের নিকট আল্লাহর ওহি পৌঁছান। জিবরীল (ﷺ) বিশেষভাবে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ (ﷺ)- এর নিকট জিবরীল (ﷺ) ওহি নিয়ে আসতেন।

(ঙ) মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ

ফেরেশতাগণের অন্য একটি দায়িত্ব আল্লাহর হুকুমে তাঁরই মর্জিমত মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ

অর্থ: মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, তাঁরা আল্লাহ তাআলার আদেশে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রাদ, ১১)

(চ) মুমিন বান্দাগণের জন্য দোআ করা

ফেরেশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম হলো ইমানদারদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ ও দোআ করা। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

অর্থ : আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। (সূরা মুমিন, ৭)

দ্বিতীয় পাঠ

কিরামান কাতেবিনের কাজ

কিরামান কাতেবিন বা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ মানুষ ভালো-মন্দ যা ই করুক না কেন সবকিছুর হুবহু রেকর্ড করেন। যে শব্দটি মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তা সাথে সাথে যথাযথভাবে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ করেন। মহান আল্লাহ বলেন–

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থ : যখন গ্রহণকারী দুই ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কার্যাবলি গ্রহণ করে সে যে কথাই উচ্চারণ করে, কিন্তু একজন অপেক্ষমান সদাপ্রস্তুত প্রহরী তার কাছে বিদ্যমান থাকে।

(সূরা ক্বাফ, ১৭-১৮)

ডানে ও বামে যে ফেরেশতা রিপোর্ট সংগ্রহ করেন তারা অতীব সম্মানিত। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফেরেশতাগণ, সম্মানিত লেখকবৃন্দ তারা জানেন তোমরা যা কর। (সূরা ইনফিতার, ১০-১২)।

তৃতীয় পাঠ
মুনকার ও নাকিরের পরিচয় ও দায়িত্ব

মুনকার ও নাকিরের পরিচয়

মুনকার (مُنْكَر) ও নাকির (نَكِيْر) দুজন ফেরেশতার নাম। যার অর্থ অপরিচিত ও বিকট চেহারাসম্পন্ন। মুনকার ও নাকির কবরে এসে মৃতব্যক্তিকে প্রশ্নকারী এমন দুজন ফেরেশতা যাদের অদ্ভুত চেহারা ও ভীতিপ্রদ গঠন অবয়বের কারণে এই রূপ নাম দেওয়া হয়েছে অথবা এ কারণে যে তারা উভয়ই মৃতব্যক্তির নিকট অপরিচিত।

মুনকার ও নাকির সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَادَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلُ مَنْ رَّبُّكَ وَمَادِيْنُكَ وَمَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ .

অর্থ : মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর কালো বর্ণের দেহবিশিষ্ট এবং নীল বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট দুজন ফেরেশতা কবরে আগমন করে। এর একজনকে বলা হয় 'মুনকার' অপরজনকে বলা হয় 'নাকির'। তারা দু'জন মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে–

مَنْ رَبُّكَ؟ - তোমার রব কে?

مَا دِيْنُكَ؟ - তোমার দ্বীন কী?

وَ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِى هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيْكُمْ - এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলেছিলে, যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল? (জামে তিরমিযি ও মেশকাত)।

মৃতব্যক্তি যদি মুমিন হয়, তবে সে জবাব দেবে–

رَبِّـى اللّٰهُ - আমার রব আল্লাহ।

دِيْنِى الإِسْلاَمُ - আমার দ্বীন ইসলাম।

আর তিনি আল্লাহর প্রিয় হাবিব এবং তাঁর রাসুল (ﷺ)।

তাদের চোখ বিজলির ন্যায় উজ্জ্বল, আওয়াজ বজ্রতুল্য এবং তাদের হাতে একটি লোহার ভারী হাতুড়ি থাকবে, যাকে হজের মৌসুম সমাগত সকল হাজিরা একত্রে মিলেও উত্তোলন করতে পারবে না। মুনকার ও নাকিরের উপর বিশ্বাস রাখা মৌলিক আকিদার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আযম আবু হানিফা (رحمه الله) বলেন- 'কবরে মুনকার ও নাকিরের প্রশ্ন ও দেহের মধ্যে রূহ এর পুনরায় ফিরে আসার কথা সঠিক, বহুসংখ্যক হাদিসের ভিত্তিতে আমরা এই বিশ্বাস করি যে, মুনকার ও নাকিরের প্রশ্ন করার বিষয়টি সত্য।' (কিতাবুল ওসিয়ত, পৃ. ২৩)।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. ফেরেশতাগণ কিসের তৈরি?

ক. আগুনের খ. পানির

গ. মাটির ঘ. নূরের

২. নবি-রাসুলদের নিকট ওহি পৌঁছান কোন ফেরেশতা?

ক. জিবরীল (عليه السلام) খ. মিকাইল (عليه السلام)

গ. ইসরাফিল (عليه السلام) ঘ. মালাকুল মাউত (عليه السلام)

৩. ফেরেশতাদের কাজ হচ্ছে—

i. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দরুদ পড়া

ii. মুমিন বান্দাদের জন্য দোআ করা

iii. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪. "কিরামান কাতেবিন" শব্দের অর্থ কী?

ক. সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ খ. সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ

গ. মহান ব্যক্তিগণ ঘ. সম্মানিত দু'জন ফেরেশতা

৫. مُنْكَر শব্দের অর্থ –

ক. অজানা খ. অপরিচিত

গ. অস্পষ্ট ঘ. হীন

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. ফেরেশতাগণের পরিচয় কী? ফেরেশতাগণের কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো।

২. মুনকার ও নাকির ফেরেশতার পরিচয় দাও। সুন্নাহর আলোকে মুনকার ও নাকির-এর দায়িত্ব আলোচনা করো।

৩. "কিরামান কাতেবিন" বলতে কী বুঝায়? আল-কুরআনে "কিরামান কাতেবিন"-এর কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা করো।

সপ্তম অধ্যায়

কিতাবসমূহের প্রতি ইমান

اَلْأِيْمَانُ بِالْكُتُبِ

প্রথম পাঠ

আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমানের গুরুত্ব

আসমানি কিতাবের পরিচয়

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি ও রাসুল (ﷺ) গণের ওপর যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন সেগুলোকে আসমানি কিতাব বলা হয়। সকল কিতাবের ওপর ইমান আনা ফরয। মুমিন বা মুসলিম হবার জন্য যেমন সমস্ত নবি-রাসুলের প্রতি ইমান আনা জরুরী, তেমনি সমস্ত আসমানি কিতাবের প্রতিও ইমান আনা অত্যাবশ্যকীয়। এটা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং মুত্তাকিদের মৌলিক গুণাবলির একটি। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের গুণাবলির বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ.

অর্থ : (মুত্তাকি তারা) যারা আপনার উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনে। (সূরা আল বাকারা, ০৪)।

আসমানি কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য

আসমানি কিতাবসমূহ নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

অর্থ : এ কিতাবকে আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, আপনি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। (সূরা ইবরাহীম, ০১)

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে আরো বলেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ.

অর্থ : আমি এ কিতাবকে আপনার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের মধ্যে আল্লাহর দেখানো সত্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে বিচার ফয়সালা করতে পারেন। (সূরা নিসা, ১০৫)

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে সঠিক ও নির্ভুল হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করা। যে হেদায়েত গ্রহণ করলে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কোনো জগতেই ভয় ও দুশ্চিন্তা কিছুই থাকবে না।

নাযিলকৃত কিতাবসমূহ

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হজরত আদম (আ) হতে আরম্ভ করে সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত একশত চারখানা আসমানি কিতাব ও সহিফা নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে চারখানা বড় ও শ্রেষ্ঠ কিতাব আর একশতখানা সহিফা বা পুস্তিকা নাযিল হয়েছে।

কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তেলাওয়াত ও লিপিবদ্ধকরণ রহিত হয়ে গেছে। এমনকি কোনো কোনো আহকামও বাতিল হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সার নির্যাস কুরআন মাজিদে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সকল আসমানি কিতাবের উপর ইমান আনার ব্যাপারে ইসলাম যে আহ্বান জানিয়েছে তার কারণ হলো দুনিয়াতে প্রত্যেক জাতির নিকটই আল্লাহর নবি-রাসুল এসেছেন তাঁর কিতাব নিয়ে। এসব কিতাবের বুনিয়াদি শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। বলা হয়েছে আল্লাহর বন্দেগি কর এবং কুফর ও শিরক থেকে দূরে থাক। এ কারণেই মুসলিম ব্যক্তির এসব কিতাবের ওপর ইমান আনা ফরয।

দ্বিতীয় পাঠ

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব

পবিত্র কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অনন্য বিশ্বকোষ। এ কিতাব একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, সকল জিজ্ঞাসার জবাব, সকল প্রয়োজনের আয়োজন এই কুরআন মাজিদে রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য চির কল্যাণকর পথ নির্দেশনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআন মাজিদে স্পষ্টভাবে প্রদান করেছেন। এ সকল হেদায়াত মানুষের জাগতিক, আত্মিক, মানসিক জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রে কল্যাণকর। বিশ্বজগতের সবকিছু এর মধ্যে বিবৃত আছে।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِى السَّمٰوَاتِ وَ لَا فِى الْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কোনো অদৃশ্য বিষয় নেই যা কুরআন মাজিদে নেই।

(সূরা নামল, ৭৫)

কুরআন মাজিদে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে এবং খাতামুন নাবিয়্যিন রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। উল্লেখ্য কুরআন মাজিদ একবারে নাজিল হয়নি বরং ধাপে ধাপে ২৩ বছর যাবৎ নাজিল হয়েছে। বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়াদনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করে–

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা দান করলাম, আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য পূর্ণতায় পৌঁছালাম, আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।

(সূরা মায়িদাহ, ৩)

স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই এই কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই এতে কোনো তাহরিফ তথা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের অবকাশ নেই।

ভাষার অলংকার ও মাধুর্য এবং বর্ণনার স্বকীয়তা কুরআন মাজিদকে সকল গ্রন্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার অন্যতম কারণ। কুরআন فُرْقَانٌ বা হক বাতিলের পার্থক্যকারী গ্রন্থ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় পাঠ
কুরআনের বিধান অস্বীকার করার পরিণাম

আল কুরআন আল্লাহর কালাম, চিরন্তন বাণী। লাওহে মাহফুযে নুরের ফলকে সংরক্ষিত। দীর্ঘ তেইশ বছরে, নুরের ফেরেশতা হজরত জিবরাইল (عليه السلام)-এর মাধ্যমে কুরআন রসুলে আকরাম (ﷺ)-এর কাছে নাযিল হয়েছে। এই কিতাব সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। বাতিল ইমান-আকিদাকে দূরীভূত করে, তাওহিদী আকিদাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নাযিল হয়েছে এই কুরআন।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

অর্থ : অবশ্যই এটা এক মহিমময় কিতাব, কোনো মিথ্যা এর সামনে থেকে বা পিছন থেকে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, এ এক প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।

(সূরা ফুসসিলাত, ৪১)।

এই কুরআনের প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও বর্ণকে মনে প্রাণে মেনে নেওয়াই হলো ইমানের দাবি। কিছু অংশ মেনে নিয়ে কিছু অংশ অস্বীকার করলে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা করেন–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ : তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ইমান আনয়ন করে কিছু অংশ অস্বীকার করছো? তোমাদের মধ্যে যারা এ কাজটা করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে অপমান, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠোর শাস্তির মাঝে নিপতিত করা হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে অনবহিত নন। (সূরা বাকারা, ৮৫)

কুরআনকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা কুফুরি। কুরআনকে অস্বীকার করা কুফরি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনকে মুক্তির দিশারী হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়াই ইমান।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. সকল আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান আনার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. কোন কিতাবকে فرقان বা হক বাতিলের পার্থক্যকারী বলা হয়?

ক. তাওরাত খ. যাবুর

গ. ইঞ্জিল ঘ. কুরআন

৩. কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

i. অধিক তেলাওয়াত

ii. সঠিক পথ প্রদর্শন

iii. ইহ-পরকালীন মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. বড় ও শ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাবের সংখ্যা কয়টি?

ক. ৪ খানা খ. ৫ খানা

গ. ৬ খানা ঘ. ৭ খানা

৫. মহাগ্রন্থ আল কুরআন কত বছরে নাযিল হয়েছে?

ক. ২২ বছর খ. ২৩ বছর

গ. ২৪ বছর ঘ. ২৫ বছর

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ

১. আসমানি কিতাব বলতে কী বুঝ? আসমানি কিতাবসমূহের উপর ইমান আনার গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২. "আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব" তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো।

৩. আল কুরআনের বিধান অস্বীকার করার পরিনাম কী? আলোচনা করো।

অষ্টম অধ্যায়
আখিরাতের প্রতি ইমান
اَلْإِيْمَانُ بِالْآخِرَةِ

প্রথম পাঠ
চিরস্থায়ী আখিরাত জীবনে মুক্তির আশা

আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী

আখিরাত (اَلْآخِرَة) অর্থ পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন। শরিয়তের পরিভাষায়, মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকাল যে জীবন চলতে থাকবে, তাকে আখিরাত বলে। কবর, হাশর, হিসাব, পুলসিরাত এবং জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। আখেরাতে বিশ্বাস মানবমনে সত্যের প্রতি আনুগত্য এবং অসত্য পরিহার করার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

এখানে যেমন পুণ্যবানদের সুখ-শান্তির শেষ নেই, তেমনি অবিশ্বাসীদের দুঃখেরও শেষ নেই। আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। যারা আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, সকল নবির যুগেই তারা কাফির বলে গণ্য হয়েছে।

আখিরাতে বিশ্বাস ইসলামের আকিদাসমূহের মধ্যে অন্যতম। আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া ইমান বিশুদ্ধ হয় না। কুরআন মাজিদে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

অর্থ : আর তারা পরকালের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (সূরা বাকারা, ৫)

আখেরাতের বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল করে তোলে। যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে না, দুনিয়ার জীবনই যার কাছে একমাত্র জীবন, যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় নেই, সে যে কোনো পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে আখেরাতে বিশ্বাস মানুষকে পবিত্র রাখে।

প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া তাওহিদ, রিসালাত ও কিতাবে বিশ্বাস করা হয় না। তাই মুমিন হওয়ার জন্য আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য।

আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী। পার্থিব জগতে যা কিছু আছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থ : যমিনের উপর যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংসশীল। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু আপনার রবের সত্তা, যিনি মহিমাময় মহানুভব। (সূরা আররহমান, ২৬-২৭)।

পরকালীন জীবনে মুক্তির উপায়

পরকালীন জীবনে মুক্তির উপায় হলো নির্ভেজাল ইমান এবং আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসুল (ﷺ)-এর প্রতি আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ মহব্বত। নাজাতের প্রথম শর্ত হলো ইমান ও আমলে সালেহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

অর্থ : যথাযথ ইমান ঠিক রেখে যে ব্যক্তি নেককাজ করবে হোক সে পুরুষ কিংবা নারী তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র কমতি করা হবে না। (সূরা নিসা, ১২৪)।

নাজাতের অপর শর্ত হলো, কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন–

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى.

অর্থ : আর যে ব্যক্তি স্বীয় রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার বাসস্থান। (সূরা নাযিআত, ৪০-৪১)।
তাই সহজেই আমরা বলতে পারি, আল্লাহর রহমত ও ইমানের সাথে নেক আমলই হলো আখেরাতে মুক্তির পথ।

দ্বিতীয় পাঠ
আমলনামা ও হাউযে কাউসার

আমলনামা বা কর্ম সংরক্ষণ রেজিস্টার

আমলনামা ফার্সি শব্দ। প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা রয়েছেন, যারা দৈনন্দিন কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করে প্রতিবেদন লিখে থাকেন। ঐ লিখিত প্রতিবেদনকেই আমলনামা বলা হয়।

কোনো ব্যক্তি ভালো কাজ করার নিয়ত করার সাথে সাথেই ঐ নিয়তের সওয়াব লেখা হয় এবং কর্ম বাস্তবায়ন করার পর কর্মের দশ গুণ সওয়াব লেখা হয়। অপর পক্ষে মন্দ কাজ করার নিয়ত করলেও আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ঐ মন্দকর্ম সম্পাদন করার পূর্ব পর্যন্ত অবকাশ দেন। তার জন্য গুনাহ লেখা হয় না, যতক্ষণ না সে ঐ মন্দ কর্ম সম্পাদন করে।

হাশরের ময়দানে পুণ্যবান লোকদের আমলনামা ডান হাতের সম্মুখ দিক থেকে প্রদান করা হবে। অপরপক্ষে পাপী লোকদের আমলনামা বাম হাতে পিছন দিক হতে প্রদান করা হবে। অণু পরিমাণ আমলও হিসাব থেকে বাদ পড়বে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه.

অর্থ : কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৭-৮)।

হাউযে কাউসার

হাউয শব্দের অর্থ কূপ। আর কাউসার দ্বারা কুরআন মাজিদে অবারিত নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় রাসুল (ﷺ)-কে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, এর মধ্যে হাউযে কাউসার অন্যতম।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

অর্থ : হে নবি (ﷺ)! আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (সূরা কাউসার, ১)

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে হাউযে কাউসার দান করেছেন। এ থেকে পিপাসার্ত মানুষকে পান করানো হবে। হাউযে কাউসারের মালিক রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই। আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেন–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) বলেন, আমার হাউয এক মাস অতিক্রম করার পথের সমান। তার চতুর্পাশ সমান। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা। তার সুগন্ধি মেশক থেকে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত। তার পান পেয়ালা আকাশের তারকার মতো অগণিত। যে একবার এ হাউয থেকে পান করবে সে কোনো দিন পিপাসার্ত হবে না। (বুখারি ও মুসলিম)

হাউযে কাউসার প্রিয়নবি (ﷺ)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া হয়েছে। হাশর ময়দানে এবং জান্নাতে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) তাঁর প্রিয় উম্মতদেরকে এ হাউয থেকে পানি পান করাবেন, এ কথা বিশ্বাস করা ইমানের অঙ্গ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. আখেরাত শব্দের অর্থ কী?

ক. কবরের যিন্দেগি
খ. হাশরের যিন্দেগি
গ. পরকালীন জীবন
ঘ. জান্নাতের জীবন

২. আমলনামা কী?

ক. নেক আমলের হিসাব
খ. গুনাহের হিসাব
গ. কর্ম সংরক্ষণ রেজিস্টার
ঘ. পার্থিব জীবনের রেজিস্টার

৩. নাজাতের অপর শর্ত হলো–

i. নেক আমল করা
ii. প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা
iii. বেশি বেশি যিকির করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

৪. আল কুরআনে বর্ণিত مثقال ذرة শব্দের অর্থ–

ক. অণু পরিমাণ
খ. কাঙ্খিত পরিমাণ
গ. স্বল্প পরিমাণ
ঘ. পরিমিত পরিমাণ

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। আমলনামা কী? "আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী" – বুঝিয়ে লেখ।

২। হাউযে কাউসার কী? 'হাউযে কাউসারে বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ" – বুঝিয়ে লেখ।

৩। মুমিন ব্যক্তি পরকালীন জীবনে কী কী উপায়ে মুক্তি পেতে পারে? আল কুরআনের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

নবম অধ্যায়
তাকদিরের প্রতি ইমান
اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ

প্রথম পাঠ
তাকদিরের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস

তাকদিরের পরিচয়

তাকদির (تَقْدِيْر) আরবি শব্দ। এটি قَدْر থেকে উৎকলিত। এর অর্থ হলো নির্ধারণ করা, পরিমাপ করা, যথাযথ হওয়ার ব্যবস্থা করা।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভালো-মন্দ, জীবন-মরণ, খাদ্য-পানীয়, মান-সম্মান সবই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। শরিয়তের পরিভাষায় এরূপ ভাগ্যলিপি বা বিধিলিপিকে তাকদির বলা হয়। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি সকল বস্তু নির্ধারিতরূপে বা পরিমাণমতো সৃষ্টি করেছি। (সূরা কামার, ৪৯)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَه تَقْدِيْرًا.

অর্থ : তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সে সবকে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

(সূরা ফুরকান, ২)

সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভালো-মন্দ, উপকার-অপকার ইত্যাদির স্থান-কাল এবং এসবের শুভ ও অশুভ পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত রয়েছে।

তাকদির বিশ্বাসের সুফল

তাকদিরের ওপর বিশ্বাস মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ। এ বিশ্বাস মুমিনকে তার মানবীয় বহু দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে। যেমন, মানুষ সফলতা অর্জন করলে আনন্দিত হয়, আবার ব্যর্থ হলে বিমর্ষ হয়। তাকদিরে বিশ্বাস মানুষকে উভয় প্রকার দুর্বলতা থেকে হেফাজত করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

অর্থ : পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে থাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটি খুবই সহজ কাজ। তা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন তার কারণে হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা হাদিদ, ২২-২৩)

তাকদিরে বিশ্বাসী মানুষ কঠিন থেকে কঠিনতর কোনো বিপদে পড়ে গিয়েও কখনো মনোবল হারায় না। তাকদিরে বিশ্বাস বান্দাকে সকল বিপদে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল করে তোলে।

দ্বিতীয় পাঠ

তাকদিরের উপর বিশ্বাস না করার পরিণাম

তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অংশ। তাকদিরে অবিশ্বাস এমন গুরুতর অপরাধ যে, মুহাম্মদ (ﷺ) নিজেও তাদেরকে লানত করেছেন।

তাকদির বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

অর্থ: আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে একটি পরিমাপ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। (সূরা ক্বামার, ৪৯)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ؕ إِنَّ ذٰلِكَ فِي كِتٰبٍ ؕ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ

অর্থ: তুমি কি জানো না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়। (সূরা হাজ্জ, ৭০)

তাকদির বিষয়ে রাসুল (ﷺ) বলেন-

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুকের তাকদীর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখেছেন। (সহিহ মুসলিম-২৬৫৩)

তাই, প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাকদিরে বিশ্বাস করা।

তাকদিরে বিশ্বাস করা যেমন ইমানের অংশ তেমনি কাজ করে যাওয়াও আল্লাহ ও রাসুল (ﷺ)-এর নির্দেশ। তাকদিরে বিশ্বাসের অর্থ সব কাজ পরিত্যাগ করে, হাত-পা গুটিয়ে ভাগ্যবাদী হয়ে বসে থাকা নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি দান করেছেন তা ব্যবহার করে কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। কাজ করা বান্দার কর্তব্য, চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর হাতে। তাই ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে সাধ্যানুযায়ী কাজ করে যাওয়াই ইসলামের নির্দেশ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. তাকদিরের উপর ইমান আনার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. কার পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টিজগত পরিচালিত হয়?

ক. ফেরেশতাদের খ. আল্লাহ তাআলার

গ. সরকার প্রধানদের ঘ. জনগণের

৩. আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মোতাবেক হয়ে থাকে, মানুষের -

i. জীবনের স্থায়িত্ব

ii. ভালো-মন্দ

iii. জীবিকা নির্ধারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. تقدير শব্দটি কোন শব্দমূল থেকে গৃহীত?

ক. قدر খ. تقدر

গ. دقر ঘ. رقد

৫. তাকদিরের উপর ইমান না রাখার পরিণাম–

ক. বিশেষ অপরাধ খ. সামান্য অপরাধ

গ. গুরুতর অপরাধ ঘ. ছোট অপরাধ

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। التقدير শব্দের অর্থ কী? তাকদিরের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২। সকল ক্ষমতার মালিক কে? 'মানুষের কাজের ফলাফল আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়ে থাকে' ব্যাখ্যা করো।

৩। "তাকদিরের ওপর অবিশ্বাস গুরুতর অপরাধ" পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

দশম অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আকিদা

اَلْعَقِيْدَةُ حَوْلَ الصَّحَابَةِ

প্রথম পাঠ

সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি ও মর্যাদা

সাহাবা (اَلصَّحَابَة) শব্দটি আরবি। এ শব্দটি সাহাবি (اَلصَّحَابِيّ)-এর বহুবচন। সাহাবি শব্দের অর্থ সঙ্গী, সাথি। পরিভাষায় সাহাবি বলা হয়–

هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِـيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَ مَاتَ عَلَى الْإِيْمَانِ.

অর্থ : যারা ইমান অবস্থায় নবি করিম (ﷺ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং মুমিন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন, তাদেরকেই সাহাবি বলা হয়। (কাওয়ায়িদুল ফিকহ, মুফতী আমীমুল ইহসান)

সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) ছিলেন দীনের আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ। নবি ও রাসুলগণের পরই তাঁদের মর্যাদা। তাঁদের শান ও মান সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে অনেক আলোচনা রয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবায়ে কেরামের সত্যবাদিতা, তাদের যোগ্যতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

অর্থ : মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল, তার সাহাবিগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সাজদাবনত দেখতে পাবেন। তাঁদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন পরিস্ফুট থাকবে। (সূরা আল ফাতহ, ২৯)

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের ইমানের দৃঢ়তা এবং পাপাচার থেকে মুক্ত থাকার আন্তরিক আগ্রহের কথা ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

অর্থ : কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ইমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন, আর কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়, তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (সূরা হুজুরাত, ৭)

সাহাবাগণের মর্যাদা বর্ণনা করে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই ইরশাদ করেন–

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

অর্থ: আমার যুগের লোকেরাই (সাহাবিগণ) হচ্ছে সর্বোত্তম লোক, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী (তাবেয়িগণ), এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী (তাবে-তাবেয়িগণ)। (মুসলিম-২৫৩৩)

দ্বিতীয় পাঠ
সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সাহাবায়ে কেরামের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থ : মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম সারির এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।

(সূরা তাওবাহ, ১০০)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا تَسُبُّوْ أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَ لاَ نَصِيْفه.

অর্থ : আমার সাহাবিগণকে গালমন্দ করো না। কেননা আল্লাহর পথে তোমাদের কারো উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করেও কোনো সাহাবির এক মুদ (প্রায় একসের) বা তার অর্ধেক দানের সমতুল্য হবে না।

(সহিহ বুখারী-৩৬৩৭, সহিহ মুসলিম-২৫৪১)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

অর্থ : আমার সাহাবিদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে বিশেষভাবে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানিও না। তাদের প্রতি ভালোবাসা আমার প্রতি ভালোবাসারই প্রমাণ এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণেরই প্রমাণ। তাদেরকে যে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল অতি সত্তর তিনি তাকে পাকড়াও করবেন। (জামে তিরমিজি, ৩৮৬২)

তৃতীয় পাঠ

সাহাবিগণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, সাহাবিগণের মন্দ আলোচনা করা, খুঁত খুঁজে বের করা কারো জন্যই বৈধ নয়, বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِخْتَارَنِيْ، وَاخْتَارَ لِيْ أَصْحَابًا. فَجَعَلَ لِيْ مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا. فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

অর্থ : নিশ্চয়ই বরকতময় আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার সাহচর্যের জন্য সাহাবিদের নির্বাচন করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আমার উজির, কাউকে আমার সহযোগী ও শ্বশুর নির্বাচন করেছেন। যারা তাদেরকে মন্দ বলবে তাদের উপরে আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানবকুলের লানত নেমে আসবে। তাদের ফরজ ও নফল কোনো আমলই কিয়ামতের দিন কবুল করা হবে না।
(মুসতাদরাক লিল হাকেম-৬৮২০)

(১) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, আমরা সাহাবায়ে কেরামের গুণ চর্চা ব্যতীত কখনো দোষ চর্চা করবো না।

(২) ইমাম মালিক (রহ.) বলেন- সাহাবিগণকে যারা হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা।

(৩) ইমাম তাহাভী (রহ.) বলেন, যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে অথবা তাদের কুৎসা রটায় আমরাও তাদেরকে শত্রু বলে মনে করি। আমরা কেবল সাহাবায়ে কেরামের গুণ চর্চা করি দোষ চর্চা করি না।

সারকথা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের প্রতি কটূক্তি হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইফা)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. সাহাবি শব্দের অর্থ হলো–

ক. সহায়ক খ. সঙ্গী

গ. সেবক ঘ. উপকারী

২. সাহাবিদের সম্মান করা–

ক. মুস্তাহাব খ. মুবাহ

গ. ওয়াজিব ঘ. মুস্তাহসান

৩. সাহাবিগণকে গালমন্দ করা–

i. মাকরুহ

ii. হারাম

iii. আল্লাহর লানতের কবলে পড়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

২০২৫

৪. اَلصَّحَابَةُ শব্দটির একবচন কী?

ক. الصحابي খ. صاحب

গ. الصحاب ঘ. صحب

৫. সাহাবি হচ্ছেন, যিনি–

i. যারা ইমান অবস্থায় নবি করিম (ﷺ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন;

ii. মুমিন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন;

iii. যারা শুধু মক্কা নগরীতে নবি (ﷺ) -এর সাক্ষাত লাভ করেছেন;

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। সাহাবিদের তা'যিম করার হুকুম কী? সাহাবিদের তা'যিম কেন করতে হবে? বুঝিয়ে লেখ।

২। সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) -এর পরিচিতি ও মর্যাদা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করো।

৩। "সাহাবিগণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে" বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

দ্বিতীয় ভাগ

আল ফিক্‌হ

اَلْفِقْهُ

প্রথম অধ্যায়

ইলমে ফিক্‌হের ইতিহাস

تَارِيْخُ عِلْمِ الْفِقْهِ

প্রথম পাঠ

ফিক্‌হের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ফিক্‌হ (اَلْفِقْـه) শব্দের অর্থ জানা, বোঝা, উপলব্ধি করা, বিচক্ষণতা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা অর্জন করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ফিক্‌হ হলো–

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَـهَا وَمَاعَلَيْهَا

অর্থ : কল্যাণকর ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্ম উপলব্ধিকে ফিক্‌হ বলে। (কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, পৃ. ৪১৪)

কুরআন মাজিদে ফিকহ ফিদদীন অর্জন করার তাগিদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ.

অর্থ : ইমানদারদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি ক্ষুদ্রদল কেন দীনের সুক্ষ্ম জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে না। (সূরা তওবা, ১২২)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাঁকে দ্বীনের ফিক্‌হ বা সুক্ষ্ম জ্ঞান দান করেন।

(সহিহ বুখারি)

প্রিয়নবি (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ.

অর্থ : প্রত্যেক বস্তুরই খুঁটি রয়েছে, আর দীনের খুঁটি হল ফিক্‌হ। (মুজামুল আওসাত ও তাবরানী)

কুরআন ও হাদিসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তাসম সূক্ষ্মজ্ঞানসমূহকে বিন্যস্ত করে আমলের উপযোগী করার জন্য ইলমে ফিক্‌হের বিকল্প নেই। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে কোনটি গ্রহণীয় আর কোনটি বর্জণীয় তা কুরআন সুন্নাহ থেকে আহরণ করে যাবতীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে যিনি যুগজিজ্ঞাসার আলোকে সমাধান পেশ করতে সক্ষম, তাঁকে ফকিহে মুজতাহিদ (فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ) বলা হয়।

প্রিয় রাসুল (ﷺ) এর যুগে শরয়ি জিজ্ঞাসার জবাব তিনি নিজেই দিতেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামের যুগে ফিক্‌হি মাসয়ালার সমাধানের জন্য ফকিহ সাহাবাগণের বোর্ড ছিল, যারা সঠিক মাসয়ালা পেশ করতেন। যার ফলে ইসলামে সর্বকালের সর্বযুগের সমাধান এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যার গ্রহণযোগ্যতা সকল যুগে সমভাবে বিদ্যমান।

দ্বিতীয় পাঠ
মাযহাবের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

মাযহাব (مَذْهَب) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মত, পথ, দল ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ফকিহ ইমামগণ চিন্তা-গবেষণা করে মাসয়ালা নির্ধারণের ব্যাপারে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন ও বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তার প্রতিটি পৃথক পৃথক সমষ্টিকে মাযহাব বলে।

ইসলামের যে সব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সে সকল ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে কোনো দ্বিমত বা মতপার্থক্য নেই। তবে মতপার্থক্য রয়েছে শরিয়তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে। আর এ মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কারণ ইসলাম মৌলিক বিষয় ঠিক রেখে স্বাধীন, মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সমর্থন ও উৎসাহিত করেছে।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ বিন হাম্বল (رحمهم الله) ছিলেন ঐসকল ভাগ্যবান ব্যক্তিদের সর্বশীর্ষে, যাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন কুরআন-সুন্নাহর গভীর গবেষণায়। যার ফলাফল মুক্তামালার ন্যায় সাধারণ মানুষের নিকট উপস্থাপিত হয়। উক্ত ইমামগণের গবেষণার মৌলিক দর্শন ও সমস্যাবলির সমাধানগুলোই মূল চার মাযহাবে বিন্যস্ত।

মৌলিকভাবে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য না থাকলেও এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে এবং বর্ণনা ও নির্ভরযোগ্যতায় ইমামদের মতপার্থক্যের কারণ থেকেই বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তীতে ঐ ইমামগণের নামানুসারে মাযহাবসমূহের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি ইত্যাদি।

মাযহাব গ্রহণ করার বিধান

যিনি মুজতাহিদ নন, এমন ব্যক্তির জন্য এ চার মাযহাবের যে কোনো একটিকে অনুসরণ করা নিরাপদ ও উত্তম। আর যিনি ফকিহে মুজতাহিদ (فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ) তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও যুগের অবস্থা গবেষণা করে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে রায় দিতে সক্ষম তার জন্য অন্য কারো মাযহাব গ্রহণ জরুরি নয়। যেমন, ইমাম বুখারি (রহ.) নিজেই ছিলেন ফকিহে মুজতাহিদ। ফকিহে মুজতাহিদ না হয়ে যারা সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে জ্ঞান অর্জন করে আমল করার চেষ্টা করেন তাদের সিদ্ধান্তে ভুল থাকার অবকাশ রয়েছে।

তৃতীয় পাঠ
ইমামগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(ক) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

নাম- নুমান, উপনাম আবু হানিফা, উপাধি ইমামে আযম (اَلإِمَامُ الأَعْظَمُ), পিতার নাম-সাবিত। তিনি ইরাকের কুফা নগরীতে ৮০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন বিশিষ্ট তাবেয়ি। তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবি হজরত আনাস (রা.)সহ কয়েকজন সাহাবির সান্নিধ্য লাভ করেন। ইতিহাস প্রণেতাগণ চারজন সাহাবির সাথে তার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তার নাম অনুসারেই এ মাযহাবকে হানাফি মাযহাব বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)–কে ইসলামি ফিক্‌হের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি এক হাজার বিজ্ঞ আলেমের সমন্বয়ে একটি ফিক্‌হ বোর্ড গঠন করেন, এর শীর্ষভাগে ছিলেন তাঁরই ৪০ জন সুদক্ষ ছাত্র। তাঁরা দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর পরিশ্রম করে ইলমে ফিক্‌হের রূপ দান করেন। এই ফিক্‌হ বোর্ড ৯৩ হাজার মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নিজে তার মাযহাবের নাম দিয়ে যাননি। তাঁর নিয়ম-নীতি অবলম্বন করে তাঁর ছাত্রগণের অসামান্য ইলমি খেদমতের ফলে ইলমে ফিক্‌হের যে ধারার সৃষ্টি হয় তা হানাফি মাযহাব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি মুসলিম বিশ্বে ইমামে আযম নামে পরিচিত।

ইলমে হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অনেক অবদান রয়েছে। মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা (مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ) নামক গ্রন্থ তাঁর মহান কীর্তি বহন করে। তিনিই সেই মহান ব্যক্তি যিনি কিতাবুল আসার (كِتَابُ الْآثَارِ) নামে সর্বপ্রথম হাদিসের সংকলন করেছেন। মোল্লা আলি কারী (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সামাআ (রহ.)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন, ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর স্বীয় রচনাবলিতে ৭০ হাজারের বেশি হাদিস বর্ণনা করেন এবং ৪০ হাজার হাদিস থেকে তিনি কিতাবুল আসার গ্রন্থিত করেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ আল ফিকহুল আকবর (اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ) ইসলামি আকাইদ বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে বিশেষভাবে সমাদৃত।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অত্যন্ত জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান যুক্তিবাদী মনীষী ছিলেন। তিনি প্রধানত কুরআনকেই গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো হাদিসের নির্ভরযোগ্যতার ওপর নিশ্চিত হতে না পারলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। তিনিই প্রথম আইন প্রণয়নে ইজমা ও কিয়াসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমানে পৃথিবীর সবচাইতে বেশি মুসলমান এই মাযহাবের অনুসরণ করে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) রাষ্ট্রীয় প্রধান কাজি (চিফ জাস্টিস)-এর পদ প্রত্যাখ্যান করায় খলিফা মানসুরের রোষানলে পড়ে ১৪২ হিজরিতে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর কারাগারে গোপনে বিষ প্রয়োগের ফলে ১৫০ হিজরি ১২ জমাদিউল উলা মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কারাগারেই শাহাদাত বরণ করেন। তাকে খিযরান নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(খ) ইমাম মালিক (রহ.)

নাম- মালিক, উপনাম–আবু আবদুল্লাহ, উপাধি ইমামু দারিল হিজরত, পিতা- আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবু আমের (রহ.)। তিনি ৯৩ হিজরিতে মদিনা তায়্যিবায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনিই মালেকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাল্যকাল থেকেই কুরআন ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশিষ্ট জ্ঞানি-গুণীদের মধ্যে স্থান লাভ করেন। তিনি বুখারি ও মুসলিম শরিফেরও পূর্বে হাদিস শাস্ত্রের প্রথম বিশুদ্ধ গ্রন্থ মুআত্তা সংকলন করেন, যা উম্মুস সহিহাইন বা বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফের জননী নামে খ্যাত। এই কিতাবটি 'মুআত্তা মালিক' (اَلْمُؤَطَّا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ) নামে পরিচিত। প্রায় এক হাজার সাত শত হাদিস এতে স্থান পেয়েছে।

মিসর, স্পেন, ইরাক, মরক্কো, জর্দান ও উত্তর আফ্রিকাতে মালেকি মাযহাবের অনেক অনুসারী রয়েছে। আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করার কারণে তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। অবশেষে ১৭৯ হিজরি ১১ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৭৯৫ খ্রি. জুন মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। মদিনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

(গ) ইমাম শাফেয়ি (রহ.)

নাম- মুহম্মদ, উপনাম- আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম- ইদরিস, মাতার নাম উম্মুল হামযা। তার পূর্ব পুরুষ শাফেয়ির নামানুসারে তিনি শাফেয়ি নামে পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ১৫০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাত বছর বয়সে কুরআন মাজিদ হিফজ করেন। দশ বছর বয়সে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক মুখস্থ করেন। পনেরো বছর বয়সে তিনি তাফসির, হাদিস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করলে উস্তাদগণ তাকে ফতোয়া দানের সনদ দেন। তিনি অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তার শিক্ষক ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ফিক্‌হশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর নাম অনুসারে এ মাযহাবকে শাফেয়ি মাযহাব বলা হয়। তিনিই এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

উসূলে ফিক্‌হের মৌলিক নীতিমালা ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) নির্ধারণ করলেও একটি মৌলিক ও স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে উসূলে ফিক্‌হ (أُصُوْلُ الْفِقْهِ) শাস্ত্রের তিনিই স্থপতি। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম তিনি 'আর রিসালাহ' (اَلرِّسَالَةُ) নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ফিক্‌হশাস্ত্রের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তার মধ্যে কিতাবুল উম্ম (كِتَابُ الْأُمِّ) অন্যতম। তার উদ্ভাবিত মাযহাব হানাফি ও মালেকি মাযহাবের মাঝামাঝি পন্থা। ইলমে হাদিসে তার দক্ষতার জন্য ইরাকের আলেমগণ তাকে نَاصِرُ السُّنَّةِ বা হাদিসের সহায়ক উপাধিতে ভূষিত করেন।

হিজরি ২০৪ সনের রজব মাসের শেষ দিন মোতাবেক ৯২০ খ্রি. ২০ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মিসরের ফুসতাতে ৫৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মিশরের ফুসতাতে তার কবর রয়েছে।

(ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

নাম- আহমদ, উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি- শায়খুল ইসলাম ও ইমামুস সুন্নাহ। পিতার নাম- মুহাম্মদ, দাদার নাম হাম্বল।

ইমাম আহমদ (রহ.) ১৬৪ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস মুতাবেক ৭৮০ ইসায়ি সনের নভেম্বর মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দাদার নামানুসারে তার মাযহাবের নাম হয় হাম্বলি। তিনি প্রথম জীবনে বাগদাদ নগরেই কুরআন, হাদিস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে কুফা, বসরা, মক্কা, মদিনা, ইয়ামেন, সিরিয়া এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে গমন করে কুরআন, হাদিস ও ফিক্‌হ বিষয়ক সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ৮ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করে ৩০ হাজার সহিহ হাদিসের সমন্বয়ে 'মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন, যা মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল (مُسْنَدُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ) নামে পরিচিত। তিনি ২৪১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বাগদাদেই তাকে সমাহিত করা হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. اَلْفِقْهُ শব্দের অর্থ কী?

ক. উপলব্ধি করা
খ. জ্ঞানার্জন করা
গ. প্রয়োগ করা
ঘ. গবেষণা করা

২. প্রসিদ্ধ ইমাম কতজন?

ক. দুইজন
খ. তিনজন
গ. চারজন
ঘ. পাঁচজন

৩. اَلإِمَامُ الأَعْظَمُ (ইমামে আযম) কার উপাধি?

ক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
খ. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)
গ. ইমাম মালেক (রহ.)
ঘ. ইমাম আহমদ (রহ.)

৪. মানবজীবনে عِلْمُ الْفِقْهِ-এর প্রয়োজন। কারণ এতে -

i. জীবনের সকল সমাধান পাওয়া যায়
ii. কুরআন হাদিসের সম্পূর্ণ অনুসরণ হয়
iii. জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

৫. ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন–

ক. ৮১ হিজরিতে খ. ৮০ হিজরিতে

গ. ৮২ হিজরিতে ঘ. ৮৩ হিজরিতে

৬. ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উপাধি–

ক. ইমামু দারিল ইসলাম খ. ইমামু দারিত দীন

গ. ইমামু দারিল হিজরত ঘ. ইমামু দারিত দুনিয়া

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। اَلْفِقْه শব্দের অর্থ কী? ইলমে ফিক্‌হের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

২। মাযহাব কী? মাযহাব গ্রহণ করার বিধান কী? মাযহাব গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

৩। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি -কে? তার জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৪। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি -এর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাজাসাত
اَلنَّجَاسَةُ

প্রথম পাঠ
নাজাসাত পরিচিতি ও প্রকারভেদ

নাজাসাত (نَجَاسَة) শব্দটি আরবি। এর অর্থ অপবিত্রতা, নাপাকি, ময়লা, নোংরা, মলিনতা। এটি তাহারাত (طَهَارَة)-এর বিপরীত শব্দ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নাজাসাত বলতে এমন বস্তুকে বোঝায়, যাকে শরিয়ত অপবিত্র বলে জানিয়েছে। যেমন : মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অপবিত্র অবস্থায় এ সকল ইবাদত কবুল হয় না। সালাত, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, কুরআন স্পর্শ প্রভৃতি ইবাদতের জন্য শরীর, পোশাক ও ইবাদতের স্থানকে নাজাসাতমুক্ত রাখা শর্ত।

নাজাসাত (نَجَاسَة) প্রধানত দু প্রকার। যথা–

(ক) নাজাসাতে হাকিকি (نَجَاسَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ) বা প্রকৃত নাপাকি

(খ) নাজাসাতে হুকমি (نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ) বা বিধানগত নাপাকি

(ক) নাজাসাতে হাকিকির পরিচিতি

نَجَاسَة শব্দের অর্থ নাপাকি আর حَقِيْقِيَّة-এর অর্থ প্রকৃত, বাস্তব। নাজাসাতে হাকিকি বলতে নাপাকির এমন এক অবস্থা বোঝায়, যা দেখা যায় এবং যা সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে এবং যে সব নাপাকি থেকে মানুষ নিজের শরীর, জামাকাপড় ও সমস্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্র রক্ষা করতে চায়। যেমন : পেশাব, পায়খানা, মদ ইত্যাদি।

ইসলামি শরিয়ত এসব থেকে দূরে থেকে পাক-পবিত্র থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

(খ) **নাজাসাতে হুকমির পরিচিতি**

نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ-এর অর্থ বিধানগত নাপাকি। যে সব অপবিত্রতা প্রকাশ্যে দেখা যায় না কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এগুলোকে অপবিত্র হিসেবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, সেগুলোকে نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ বলা হয়। যেমন : অজুবিহীন অবস্থায় থাকা, গোসলের প্রয়োজন হওয়া।

নাজাসাতের বিধান

উভয় প্রকার নাজাসাতের হুকুম হচ্ছে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী তা থেকে পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র অবস্থায় থাকা কোনো মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না। অজু ছাড়া সালাত আদায় ও কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। তাই নাজাসাত থেকে পবিত্র থাকা ইমানি দায়িত্ব।

নাজাসাতে হাকিকির প্রকার

নাজাসাতে হাকিকি আবার দু প্রকার। যথা–

(ক) اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ (কঠিনতর অপবিত্রতা)।

(খ) اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ (সহজতর অপবিত্রতা)।

اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ-এর পরিচয় ও হুকুম

যে সকল নাপাক বা অপবিত্র হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং সন্দেহাতীতভাবে অপবিত্র, সেগুলোকে নাজাসাতে গালিজা বলে। যেমন : পেশাব, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।

এ প্রকারের নাজাসাত শরীরে অথবা কাপড়ে লেগে থাকলে, তা পাক না করলে সালাত জায়েয হবে না, (শরয়ি ওযর থাকলে ভিন্ন কথা)। শরয়ি ওজর বলতে এমন সময় বা স্থানে শরীরে নাপাক লাগাকে বোঝায়, যা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই বা নাপাক লাগা কাপড় ছাড়া বিকল্প কাপড় নেই। এ অবস্থায় নাপাক লেগে থাকলেও তা নিয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ-এর পরিচয় ও হুকুম

যে সকল বস্তু অপবিত্র হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়, অপেক্ষাকৃত হালকা ও সহজতর, সেগুলোকে নাজাসাতে খফিফা বলে। যেমন : হালাল প্রাণীর পেশাব, হারাম পাখির মল ইত্যাদি।

এ জাতীয় অপবিত্রতা শরীর বা কাপড়ের কোনো অংশের এক চতুর্থাংশ স্থানে লাগলে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে তা নিয়ে সালাত আদায় করা জায়েয হবে। প্রকাশ থাকে যে, নাপাকি যত সামান্য হোক না কেন বিনা ওজরে তা নিয়ে সালাত আদায় করা উচিত নয়।

নাজাসাতে গালিজার একটি তালিকা

১. শূকর ও কুকুরের প্রতিটি বস্তুই নাজাসাতে গালিজা।

২. মানুষের পেশাব-পায়খানা।

৩. মানুষ অথবা পশুর রক্ত।

৪. বমি (যে কোনো বয়সের মানুষের হোক)

৫. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত বা পুঁজ অথবা অন্য কোনো তরল পদার্থ।

৬. যে সব পশুর ঝুটা নাপাক তাদের ঘাম ও লালা।

৭. যবেহ ছাড়া মৃত পশুর গোশত ও চর্বি।

৮. নাপাক বস্তু থেকে নির্গত নির্যাস।

৯. মদ ও এ জাতীয় অন্যান্য মাদক দ্রব্য।

নাজাসাতে খফিফার একটি তালিকা

১. হালাল পশুর পেশাব। যেমন : গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি।

২. হারাম পাখির মল। যেমন : কাক, চিল, বাজ। কিন্তু বাদুরের পেশাব পায়খানা পাক।

৩. ঘোড়ার পেশাব।

৪. হালাল পাখির পায়খানা যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

৫. নাজাসাতে খফিফা যদি নাজাসাতে গালিজার সাথে মিশে যায় তাহলে নাজাসাতে গালিজার পরিমাণ যত কমই হোক বা বেশি হোক তখন সব নাজাসাতে গালিজা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পাঠ
নাজাসাতযুক্ত পানির বিধান

(ক) নাপাক পানি : যেমন– প্রবাহমান পানিতে নাপাকি পড়ে যদি পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্য রঙ, স্বাদ ও গন্ধ বদলে ফেলে, তবে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। আবদ্ধ অনেক পানি কিন্তু নাপাকি পড়ার কারণে পানির রং স্বাদ ও গন্ধ বদলে গেছে অথবা আবদ্ধ পানিতে নাজাসাত পড়েছে কিন্তু তার দ্বারা পানির রং, স্বাদ ও গন্ধে কোনো পরিবর্তন আসেনি, সে সব পানি দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয নয় এবং তা দিয়ে কোনো নাপাক বস্তু পবিত্র করা যাবে না।

(খ) মাশকুক বা সন্দেহযুক্ত পানি : এমন পানি যা দিয়ে অজু গোসল জায়েয হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ আছে। যেমন যে পানিতে গাধা বা খচ্চর মুখ দিয়েছে। মাশকুক পানির হুকুম এই যে, এ পানি দিয়ে অজু করার পর তায়াম্মুম করতে হবে। (তাহতাবী)

(গ) স্রোতের পানিতে যদি নাজাসাত পড়ে এবং তাতে পানির রং স্বাদ ও গন্ধে পরিবর্তন দেখা না দেয় তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয। বড় পুকুর বা দীঘি যার একদিকে পানি নাড়া দিলে অন্য দিকে নড়ে না এ ধরনের পুকুরের এক দিকে নাপাকি পড়লে অন্য দিকের পানি দিয়ে তাহারাত হাসিল করা জায়েয।

পবিত্র পানিতে ব্যবহৃত পানি মিশে গেলে এবং ব্যবহৃত পানি পরিমাণে বেশি হলে সমস্ত পানিই ব্যবহৃত পানি বলে গণ্য হবে এবং তা দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয হবে না।

তৃতীয় পাঠ
কয়েকটি নাজাসাত (নাপাক) প্রাণী

আল্লাহ তাআলা পশু, পাখি ও প্রাণী জগতের বহুপ্রজাতিকে মানুষের জন্য হালাল করেছেন এবং কোনো কোনো প্রাণীকে হারাম করেছেন।

যেসকল প্রাণী হালাল করেছেন

আল্লাহ তাআলা যে সকল প্রাণী হালাল করেছেন, তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১। জলচর প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মাছ হালাল। মাছ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীই হালাল নয়।

২। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

অর্থ : চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য এতে শীত নিবারক উপকরণ ও অনেক উপকার রয়েছে। এ থেকে তোমরা আহার করে থাকো। (সূরা নাহল, ৫)।

এ সকল প্রাণীর মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, উট, হরিণ, ভেড়া ইত্যাদি।

যেসকল প্রাণী হারাম করেছেন

আল্লাহ তাআলা যে সকল প্রাণী হারাম করেছেন, উহার কয়েকটি নিম্নরূপ –

১। দন্ত দিয়ে শিকারকারী হিংস্র জন্তু এবং নখ দিয়ে শিকারকারী প্রাণী খাওয়া জায়েয নয়। যেমন : বাঘ, সিংহ, চিতা, বানর, ভাল্লুক, হাতি, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি।

পাখির মধ্যে ঈগল, বাজ, শকুন, চিল, কাক ইত্যাদি। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সাপ, গুই সাপ, বেজী, ইঁদুর, চিকা, বাদুর, কচ্ছপ ইত্যাদি।

২। কুরআন মাজিদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে–

(ক) মৃত জন্তু;

(খ) শুকরের মাংস;

(গ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত জন্তু।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. নাজাসাত প্রধানত কয় প্রকার?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

২. নিচের কোনটি নাজাসাতে গালিজার উদাহরণ?

ক. গরুর পেশাব খ. বাদুরের পেশাব

গ. ঘোড়ার পেশাব ঘ. মানুষের পেশাব

৩. কোন পাখির গোশত খাওয়া হালাল?

ক. ঈগল খ. চিল

গ. কাক ঘ. কবুতর

৪. نَجَاسَة শব্দের বিপরীত শব্দ–

ক. طهارة খ. نظافة

গ. سماحة ঘ. كرامة

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। নাজাসাত কী? নাজাসাত প্রধানত কত প্রকার? উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

২। নাজাসাত যুক্ত পানির বিধান কী? তোমার পাঠ্যবইয়ের আরোকে বর্ণনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়
তাহারাত
اَلطَّهَارَةُ

প্রথম পাঠ
পবিত্রতা অর্জন ও পবিত্রকরণ

(ক) চামড়া পবিত্র করার নিয়ম

চামড়া একটি জরুরি বস্তু। তা দিয়ে জুতা, ব্যাগসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি হয়। চামড়া শুধু পানি দিয়ে ধৌত করলে পাক হয় না। হালাল পশু বা হারাম পশু কিংবা তৃণভোজী পশু অথবা হিংস্র যে কোনো পশুর চামড়াও দাবাগাত করার পর পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু মজ্জাগত নাপাক যেমন শুকর যা কোনোদিন কোনোভাবেই পাক হয় না। তার চামড়াও কোনোরূপে পাক করা যায় না। হালাল পশু যেমন উট, মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এ সবের চামড়া পশু যবেহ করার পরই তা পবিত্র হয়ে যায়, দাবাগাত করা শর্ত নয়। চামড়াতে লবণ মিশিয়ে চামড়া পরিশোধন পাউডার লাগিয়ে তার চর্বি ফেলে দিয়ে তাকে ব্যবহার উপযোগী করার নাম দাবাগাত। কোনো নাপাক জিনিস দিয়ে চামড়া দাবাগাত করা হলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেই পাক হয়ে যায়।

(খ) জমাট বস্তু

জমাট হওয়া ঘি, চর্বি অথবা মধুর কোনো অংশে নাপাকি পড়ার কারণে নাপাক হয়ে গেলে, নাপাক অংশটুকু বাদ দিলেই তা পাক হয়ে যায়। সানা আটা অথবা শুকনো আটাও একই হুকুম। যেমন : সানা আটার উপর যদি কুকুর মুখ দেয় তাহলে যে অংশে কুকুরের লালা লেগেছে সে অংশটুকু ফেলে দিলেই বাকিটা পাক হয়ে যাবে। মোটকথা জমাট হওয়া অংশের মধ্যে নাপাক লাগা অংশটুকু ফেলে দিলেই বাকি অংশ পাক হয়ে যাবে।

(গ) তৈলাক্ত জিনিস

তৈল অথবা ঘি যদি নাপাক হয় তাহলে তৈল বা ঘিয়ে সমপরিমাণ পানি ঢেলে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। পানি শুকিয়ে যাবার পর পুনরায় ঐ পরিমাণ পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হয়ে যাবে। অথবা তৈল বা ঘি এর মধ্যে পানি দিতে হবে এভাবে যখন পানির উপর তৈল বা ঘি তখন তা উপর থেকে তুলে নিয়ে আবার পানি ঢালতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পাক হয়ে যাবে।

মধু, শরবত নাপাক হলে অনুরূপ পানি দিয়ে তিনবার জ্বাল দিলে তা পাক হয়ে যাবে। নাপাক তৈল মাথায় বা শরীরে মালিশ করলে তিনবার ধুয়ে শরীরকে পবিত্র করা যায়।

(ঘ) কুকুরের উচ্ছিষ্ট

কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। কিন্তু যে পাত্রে বা প্লেটে কুকুর মুখ লাগিয়েছে তা তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়। তবে শেষ বার মাটি দ্বারা তা ভালোভাবে মাড়িয়ে তারপর ধৌত করার কথা হাদিস শরিফে বলা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে, কুকুরের লালাতে যে বিষাক্ত জীবাণু রয়েছে মাটি দ্বারা মাড়িয়ে পানি দ্বারা ধৌত করলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

ইসতিনজা ও পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি

ইসতিনজা (اِسْتِنْجَاء) শব্দটি আরবি। এর অর্থ নিষ্কৃতি লাভ করা, নিরাপদ হওয়া, বেঁচে যাওয়া, অপবিত্রতা দূর করা, মলমূত্র ত্যাগ করা।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, পেশাব-পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জনকে اِسْتِنْجَاء বলা হয়। ইসলামি শরিয়তে ইসতিনজার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইসতিনজা থেকে পবিত্রতা অবলম্বনে অবহেলা করা বড় ধরনের কবিরা গুনাহ। যেমন পেশাবের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে না থাকাকে মহানবি (ﷺ) কবরের আযাবের কারণ বলে হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

মহানবি (ﷺ) বলেন– أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ

অর্থ : বেশিরভাগ কবর আযাবের কারণ হলো পেশাব। (মুসনাদে আহমদ)।

পেশাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি

ইসতিনজার নিয়ম ও পদ্ধতি নিম্নরূপ–

১। কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা ত্যাগ না করা। কারণ কিবলাকে সম্মান করা ইমানের অঙ্গ। শরিয়তের বিধান মতে ফরয। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرُوْهَا

অর্থ : তোমরা পেশাব-পায়খানার সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে দিয়ে বসবে না।

২। গর্তে বা শক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা না করা।

৩। ছায়াদানকারী গাছের নিচে, নদী ও পুকুরের ঘাটে ও ফলবান গাছের নিচে পেশাব-পায়খানা না করা।

৪। জনসাধারণের চলাফেরার রাস্তায়, কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা না করা।

৫। দাঁড়িয়ে পেশাব-পায়খানা না করা।

৬। পেশাব-পায়খানা করার সময় বিনা কারণে কথা না বলা।

৭। টয়লেটে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার দোআ পড়া।

৮। মাথায় যে কোনো ধরনের কাপড় দিয়ে টয়লেটে যাওয়া এবং জুতা পায়ে রাখা।

৯। পেশাব-পায়খানা করার সময় সম্পূর্ণ সতর না খুলে প্রয়োজনীয় অংশ খোলা।

১০। টয়লেটে প্রবেশ করার পূর্বে নিম্নোক্ত দোআ পড়ে আগে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১১। টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হয়ে নিম্নোক্ত দোআ পড়া–

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَ عَافَانِيْ

অর্থ : আমি তোমার ক্ষমা প্রত্যাশী। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে শান্তিদান করেছেন।

১২। টয়লেট পেপার/কুলুখ ব্যবহার করা। পেশাব-পায়খানা করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী টয়লেট পেপার বা মাটির ঢিলা দিয়ে মলদ্বার ভালোভাবে পরিষ্কার করে তারপর পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নত। টয়লেট পেপার বা ঢিলা পাওয়া না গেলে শুধু পানি দিয়েও পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

১৩। হাড়, কয়লা, কাঁচ, লোহা, তামা, পিতল, অথবা এমন কঠিন ধাতু যা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করলে মলদ্বারে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এমন সব কঠিন বস্তু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৪। মানুষ ও পশু যে সব বস্তু থেকে উপকার লাভ করে এবং যে সব বস্তুর সম্মান করা জরুরি। সে সব বস্তু ঢিলা, কুলুখ হিসেবে ব্যবহার করা নিষেধ।

১৫। নাপাকি মলদ্বারের বাইরে ছড়িয়ে না পড়লে ঢিলা, কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, আর ছড়িয়ে পড়লে ফরয।

১৬। শৌচকার্য বাম হাত দ্বারা করতে হবে এবং এরপর সাবান বা মাটি দ্বারা উত্তমভাবে হাত ধৌত করতে হবে।

১৭। পবিত্রতার জন্য মাটির ঢিলা ব্যবহার করা ভালো। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে টয়লেট পেপার তবে ব্যবহারের সাথে সাথে পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করা উচিত। পেশাবের পর টয়লেট পেপার ব্যবহারের সময় ততটুকু সময় দিতে হবে যেন পরে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব বের না হয়।

পায়খানা বা প্রস্রাবের পর মাটির চাকা, পাথরের টুকরা বা টয়লেট পেপার ব্যবহারকে ইস্তেজমার বলে। اَلْاِسْتِجْمَار অর্থ কুলুখ ব্যবহার করা। কমপক্ষে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। পেশাবের পর পুরুষ কুলুখ ব্যবহার করবে। এক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। এমন অবস্থা করা যাবে না যাতে অন্যদের অসুবিধা বা অস্বস্তি ও হাসির কারণ হয়।

তাহারাত অর্জনের পদ্ধতি

তাহারাত অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তা হলো–

১। অজুর মাধ্যমে মুখমণ্ডল, হাত, পা মাথাসহ পুরো দেহ পবিত্র হয়ে যায়।

২। অসুস্থ হলে বা পানি পাওয়া না গেলে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্মুমের নিয়ত করে মুখ ও হাত মাসেহ করার মাধ্যমে পবিত্র করা যায়।

৩। গোসলের মাধ্যমে গোটা শরীর পবিত্র করা যায়।

৫। শরীর বা কাপড়ে অপবিত্র কিছু লেগে গেলে পানি ও সাবান বা পাউডার দিয়ে তা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা যায়। তবে সে সাবান ও পাউডার পবিত্র উপাদানে তৈরি হতে হবে।

তাহারাতের আরেক দিক হলো মনের পবিত্রতা। মনের পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন খালেসভাবে অতীতের গুনাহের জন্য তওবা করা। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলসমূহ ঠিকমতো আদায় করা। হারাম ও মাকরুহ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকা। আত্মিক উন্নতির জন্য বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত, দরুদ শরিফ পাঠ ও যিকিরে মশগুল থাকা।

যদি কোনো সাবান ও কাপড় ধোয়ার পাউডারে শূকরের চর্বি থাকে, তবে সেগুলো ব্যবহার না করা উচিত। কারণ শূকরের চর্বি নাপাক, যা কাপড় ও শরীরকে নাপাক করবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. নিচের কোন প্রাণীর চামড়া নাপাক?

ক. উট খ. মহিষ

গ. ছাগল ঘ. শুকর

২. পেশাব-পায়খানার পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. নফল

৩. اِسْتِنْجَاء শব্দটির অর্থ কী?

ক. পবিত্র হওয়া খ. ইচ্ছা করা

গ. সংকল্প করা ঘ. গোপন করা

৪. তায়াম্মুম করতে হয়, যিনি–

i. মারাত্মক অসুস্থ

ii. পানি ব্যবহারে অক্ষম

iii. অজুর নিয়ম না জানলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৫. কমপক্ষে কয়টি ঢিলা ব্যবহার করতে হয়।

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৬টি

৬. বেশির ভাগ কবর আযাবের কারণ হলো–

ক. পেশাব করে পবিত্রতা অর্জন না করা খ. পায়খানা করে পবিত্রতা অর্জন না করা

গ. মিথ্যা বলা ঘ. গিবত করা

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। اَلِاسْتِنْجَاء শব্দের অর্থ কী? ঢিলা কুলুখ ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করো।

২। ইসতিনজার নিয়ম ও পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩। তাহারাত অর্জনের পদ্ধতিগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে আলোচনা করো।

দ্বিতীয় পাঠ

তায়াম্মুম

اَلتَّيَمُّمُ

তায়াম্মুমের পরিচয়

তায়াম্মুম (تَيَمُّم) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলা হয়, পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্র হওয়ার নিয়তে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। যথা–

১। পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা ;

২। উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা ও

৩। উভয় হাত পাক মাটিতে মেরে প্রথমে বাম হাত দ্বারা ডান হাত এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নত

তায়াম্মুমের সুন্নতসমূহ নিম্নরূপ–

১। তায়াম্মুমের শুরুতে তাসমিয়া পড়া ;

২। সুন্নত তরিকায় অর্থাৎ তারতিব ঠিক রেখে তায়াম্মুম করা। প্রথমে চেহারা মাসেহ করা এবং তারপর দু হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা ;

৩। পবিত্র মাটির উপর হাতের তালুর দিক মারা, পিঠের দিক নয় ;

৪। হাত মাটিতে মারার পর ঝেড়ে ফেলা ;

৫। মাটিতে হাত মারার সময় আঙুলগুলো প্রসারিত রাখা যাতে ভেতরে ধুলো পৌঁছে যায় ;

৬। কমপক্ষে তিন আঙুল দিয়ে চেহারা ও হাত মাসেহ করা এবং

৭। চেহারা মাসেহ করার পর দাড়ি খিলাল করা।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

১। প্রথমে নিয়ত করে بِسْمِ اللهِ বলে তায়াম্মুম শুরু করতে হবে।

২। অতঃপর দু হাত পাক মাটির উপর মারবে। বেশি পরিমাণ ধুলাবালি লাগলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা মুখ দিয়ে ফুঁক দিয়ে আলগা ধুলা কমিয়ে নিতে হবে। মুখমণ্ডল মাসেহ করবে, যাতে চুল পরিমাণ স্থানও বাদ না যায়।

৩। পুনরায় পূর্বের ন্যায় মাটির উপর হাতে মেরে এবং হাত ঝেড়ে নিয়ে প্রথমে বাম হাতের তিন আঙুলের মাথার নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক থেকে শুরু করে কনুইসহ মাসেহ করবে। তারপর বাম হাতের তালুসহ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে কনুই থেকে অঙ্গুলি পর্যন্ত ভিতরের অংশ মাসেহ করবে। এবং আঙ্গুলগুলোর খিলালও করবে। পরে এভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করবে। তাতে ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ করতে হবে। (আলমগিরি, ১/৩০)

অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। তায়াম্মুমের এ অনুমতি মহান আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ।

কখন তায়াম্মুম বৈধ

অজুবিহীন অবস্থায় শরীর নাপাক হলে, হায়েয ও নেফাস শেষে পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করা জায়েয।

অপারগতার ব্যাখ্যা এই যে, পানি আছে কিন্তু ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা আছে অথবা স্বাস্থ্যের উপর এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যাতে জীবন নাশ হতে পারে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয। অথবা পানি আছে তার পার্শ্বে শত্রু অথবা হিংস্র প্রাণী থাকে। সফরে পানি সঙ্গে আছে; কিন্তু সামনে কোথাও পানি না পাওয়া যাওয়ার আশংকা থাকতে পারে। অথবা অজু বা গোসল করলে সালাতের সময় চলে যেতে পারে যে সালাতের কাযা নেই। যেমন: ঈদের সালাত। পানি কেনার সামর্থ না থাকলে অথবা পানি কিনলে সংকটে পড়ার আশংকা থাকলে। এসব অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয।

তায়াম্মুম করার পর তা ভঙ্গ হওয়ার কারণ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তা দিয়ে সকল ইবাদত করা যাবে।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

১। যে সব কারণে অজু নষ্ট হয় সে সব কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়।

২। অজু ও গোসল উভয়ের জন্য একই তায়াম্মুম করলে যদি অজু নষ্ট হয় তাহলে অজুর তায়াম্মুম নষ্ট হবে কিন্তু গোসলের তায়াম্মুম নষ্ট হবে না। তবে তায়াম্মুমের পরে গোসল ওয়াজিব হয় এমন কোনো কারণ ঘটলে গোসলের তায়াম্মুমও নষ্ট হবে।

৩। পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করা হয়ে থাকলে পানি পাওয়া মাত্র তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়।

৪। রোগের জন্য তায়াম্মুম করা হলে রোগ সেরে যাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়।

৫। পানির নিকটে কোনো হিংস্র জন্তু, সাপ অথবা শত্রু থাকার কারণে তায়াম্মুম করা হয়ে থাকলে যখনই এ আশঙ্কা চলে যাবে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে।

যে সব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ

পবিত্র মাটি, বালু, পাথর, বিলাতি মাটি, চুনাপাথর, হরিতাল, সুরমা, গেরুমাটি প্রভৃতি। এ জাতীয় জিনিস না পেলে তায়াম্মুম জায়েয হবে না। যেমন, সোনা, রূপা, রং, কাঠ, কাপড় এবং শস্য প্রভৃতি। কিন্তু যদি এসব জিনিসের উপর মাটি জমে থাকে তবে মাটির কারণে তাতে তায়াম্মুম জায়েয হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. তায়াম্মুমের ফরজ কয়টি?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

২. নিচের কোনটি তায়াম্মুমের সুন্নত?

ক. নিয়ত করা খ. হাত মাসেহ করা

গ. মুখ মাসেহ করা গ. তাসমিয়া পড়া

৩. তায়াম্মুমের সুন্নত হচ্ছে

i. তারতিব ঠিক রাখা

ii. চেহারা ও হাত মাসেহ করা

iii. চেহারা মাসেহের পরে দাঁড়ি খিলাল করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৪. تَيَمُّم শব্দের অর্থ কী?

ক. ইচ্ছা করা

খ. তলব করা

গ. মনোনিবেশ করা

ঘ. অর্জন করা

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। تَيَمُّم-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তায়াম্মুম করার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

২। তায়াম্মুম এর ফরয ও সুন্নাহ কয়টি? বর্ণনা করো।

৩। কখন তায়াম্মুম বৈধ? তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ উল্লেখ করো।

তৃতীয় পাঠ
মেসওয়াক
اَلسِّوَاكُ

মেসওয়াকের পরিচয়

মেসওয়াক (مِسْوَاك) শব্দটি س و ك ধাতু থেকে নির্গত। হাদিস শরিফে اَلسِّوَاك শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ মাজা, ঘষা, দাঁত মর্দন ও দাঁত পরিষ্কারকরণ। যে বস্তু দিয়ে তা করা হয়, তাকে مِسْوَاك বলা হয় ।

পরিভাষায় মেসওয়াক বলা হয়, গাছের ডাল বা শিকড়কে, যা দিয়ে দাঁত মাজা ও পরিষ্কার করা হয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ.

অর্থ : মেসওয়াক করলে যেমন মুখ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়, তেমনি এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। (সহিহ বুখারি ও নাসায়ি)।

প্রিয় রাসুল (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

لَوْ لاَ أَن اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وَضُوْءٍ.

অর্থ : আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক হবে মনে না করলে আমি প্রত্যেক অজুর সময়ই মেসওয়াক করার জন্য আদেশ করতাম। (সহিহ বুখারি ও সহিহ ইবনি খুজাইমা)

আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِيْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا.

অর্থ : মেসওয়াক করে যে সালাত আদায় করা হয় সে সালাতে মেসওয়াকবিহীন সালাতের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি ফযিলত রয়েছে। (বায়হাকি ও মিশকাত)

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন- মেসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়।

মেসওয়াকের মধ্যে থাকে ফসফরাস জাতীয় পদার্থ। পীলু গাছের ডালে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অধিক পরিমাণে থাকে। মেসওয়াকের ফলে বিশেষ করে পীলু গাছের মেসওয়াক মুখে স্বাদ ফিরিয়ে আনে, টন্সিল রোগীর জন্য মহৌষধ।

মেসওয়াকের আকৃতি

তিক্ত বৃক্ষের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। এতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, দাঁতের মাড়ি শক্ত হয় এবং হযম শক্তি বৃদ্ধি পায়। যায়তুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা উত্তম। পিলু, বাবলা, কানি গাছের মেসওয়াক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। নিম গাছের ডাল দাঁতের জন্য উপকারী হলেও শরীরের শক্তি হ্রাস করে।

মেসওয়াক তাজা, কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ন্যায় মোটা ও এক বিঘত পরিমাণ দীর্ঘ হতে হবে। হাতের আঙুল মেসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হয় না। তবে মেসওয়াক পাওয়া না গেলে ডান হাতের আঙ্গুল বা শক্ত কাপড়ের অংশ মেসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (আলমগিরি)

মেসওয়াক যেন খুব শক্ত কিংবা খুব নরম না হয়ে বরং মাঝামাঝি হওয়া উত্তম। এক বিঘতের চেয়ে কম হওয়া অনুচিত। ব্যবহার করতে করতে ছোট হয়ে গেলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

মেসওয়াক করার পদ্ধতি

মেসওয়াকের মাসনুন তরিকা হলো ডান হাতে এভাবে ধারণ করতে হবে যেন কনিষ্ঠ আঙুল থেকে মেসওয়াকের নিম্ন অংশের নিচে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মেসওয়াকের উপরের অংশের নিচের দিকে ও অন্যান্য আঙুলগুলো মেসওয়াকের উপরে থাকে। মুখের ডান দিক থেকে শুরু করা এবং দাঁতের প্রস্থের দিক থেকে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব; লম্বালম্বিভাবে নয়। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর, সালাতের অজু করার পূর্বে, মজলিসে যাওয়ার পূর্বে এবং কুরআন ও হাদিস তেলাওয়াত করার পূর্বে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ)

অজুর সময় কুলি করার পূর্বে মেসওয়াক করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। অন্যান্য সময় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। সাওম পালনকারীর জন্য সকাল-সন্ধ্যা যে কোনো সময়ে মেসওয়াক ব্যবহারে কোনো অসুবিধে নেই।

ব্রাশ ব্যবহার

মেসওয়াক না থাকা অবস্থায় কেউ যদি টুথ ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করে তাতে দাঁত পরিষ্কার হবে, পরিচ্ছন্নতার সওয়াব হবে এবং মেসওয়াকের যে সওয়াব তা পাওয়া যাবে। যে সব টুথ ব্রাশ শুকরের পশম বা অন্য কোনো নাপাক অথবা হারাম বস্তু দ্বারা তৈরি করা হয় ঐ সব ব্রাশ ব্যবহার করা জায়েয নয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. কোন শব্দ থেকে مِسْوَاك শব্দটি নির্গত হয়েছে?

ক. أَسْوَاك খ. سِوَاك

গ. سُوْك ঘ. سَوِيْك

২. অজুর ক্ষেত্রে মেসওয়াক করার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩. মেসওয়াক করলে -

i. মস্তিষ্ক সতেজ হয়

ii. মুখ দুর্গন্ধমুক্ত হয়

iii. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i,ii ও iii

৪. হাদিস শরিফে মেসওয়াক বলতে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. السواك খ. السويك

গ. الأسواك ঘ. المعجون

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। মেসওয়াক কী? মেসওয়াক এর ফজিলত হাদিসের আলোকে বর্ণনা করো।

২। মেসওয়াক করার পদ্ধতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে আলোচনা করো।

৩। পাঠ্য বইয়ের আলোকে মেসওয়াকের আকৃতি সম্পর্কে লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

সালাতের জন্য ইকামত

اَلْإِقَامَةُ لِلصَّلَاةِ

প্রথম পাঠ

ইকামতের পরিচয়

ইকামত (اَلْإِقَامَة) শব্দের অর্থ দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠিত করা। শরিয়তের পরিভাষায় জামাআত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আযানের শব্দ বা বাক্যসহ সালাত আরম্ভ হওয়ার কথা ঘোষণা করাকেই 'ইকামত' বলে।

ইকামতের বাক্যসমূহ

ইকামতের বাক্যসমূহ আযানের অনুরূপ। তবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ অতিরিক্ত দু বার বলতে হয়। নিম্নে ইকামতের বাক্যসমূহ উল্লেখ করা হলো–

ক্রমিক নং	ইকামতের বাক্যসমূহ	বাক্যসমূহের অর্থ	উচ্চারণ করতে হবে
১	اَللّٰهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ মহান।	৪বার
২	اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।	২বার
৩	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল।	২বার
৪	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	এসো সালাতের দিকে।	২বার
৫	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	এসো কল্যাণের দিকে।	২বার
৬	قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ	সালাত কায়েম হয়েছে।	২বার
৭	اَللّٰهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ মহান।	২বার
৮	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ	আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।	১বার

ইকামতের মধ্যে এভাবেই ৮টি বাক্য ১৭ বার উচ্চারণ করতে হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

ইকামতের সুন্নত তরিকা

ইকামত অর্থ দাঁড় করানো। জামায়াত শুরু হওয়ার আগে আযানের কথাগুলো পুনরায় বলা এবং এ কথা ঘোষণা করা যে, জামায়াত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এ জন্যে ইকামতে حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ এরপর قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ বলা হয়, অর্থাৎ সালাত দাঁড়িয়ে গেছে। এর জওয়াবে মুসল্লিগণও বলবে- قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ইকামতের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. ইকামতে اَللّٰهُ أَكْبَرُ কয়বার বলতে হয়?

ক. দুই খ. চার

গ. ছয় ঘ. আট

২. اِقَامَة শব্দের অর্থ কী?

ক. দাঁড় করানো খ. মজবুত করা

গ. প্রস্তুত হওয়া ঘ. শুরু করা

৩. আযান ও ইকামতের মধ্যে অতিরিক্ত বাক্য হচ্ছে -

i. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةُ

ii. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

iii. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

৪. إِقَامَة এর মধ্যে কয়টি বাক্য বলতে হয়?

ক. ১৫টি খ. ১৬টি

গ. ১৭টি ঘ. ১৮টি

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। إِقَامَة শব্দের অর্থ কী? ইকামতের সুন্নত তরিকা কী? বর্ণনা করো।

২। ইকামতে قَدْ قَامَتِ الصلَاةُ বলা হলে জবাবে কী বলতে হবে?

পঞ্চম অধ্যায়

আস সালাত

اَلـصَّلَاةُ

প্রথম পাঠ

আহকামুস সালাত

সালাতের গুরুত্ব ও উপকারিতা

সালাত (اَلصَّـلَاةُ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোআ, রহমত, ইসতিগফার ও তাসবিহ ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় সালাত বলতে বোঝায়–

هِيَ عِبَادَةٌ ذَاتُ أَقْوَالٍ وَ أَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ وَمُخْتَتِمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ.

অর্থ : সালাত এমন কিছু সুনির্ধারিত কথা ও কাজবিশিষ্ট ইবাদত, যা তাকবিরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাত। ফার্সি ভাষায় সালাতকে নামাজ বলে। ইবাদতের মধ্যে সালাতকে عِمَادُ الدِّيْنِ বা দ্বীনের খুঁটি বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর হয় না, তদ্রূপ সালাত ছাড়াও দ্বীন পরিপূর্ণ হয় না। সালাত যে ফরজ তা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। বালিগ পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই তা অবশ্য পালনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّكِعِيْنَ.

অর্থ : তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।
(সূরা বাকারা, ৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا.

অর্থ : নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের জন্য অবশ্যকর্তব্য। (সূরা নিসা, ১০৩)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اِتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

অর্থঃ তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর। তোমাদের রমযান মাসের রোজা রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের আমিরের অনুসরণ কর, তবেই তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযি-৬১৬)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟
قَالُوْا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

অর্থ : তোমাদের কি মত! যদি কারো ঘরের দরজায় কোনো নদী থাকে এবং তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে নিয়মিত গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে?
সাহাবায়ে কেরাম বললেন- 'না তার দেহে কোনো ময়লাই থাকতে পারে না'। তখন নবি করিম (ﷺ) বললেন- 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্তও ঠিক তদ্রূপ। আল্লাহ এ সকল সালাতের মাধ্যমে যাবতীয় গুনাহ খাতা দূর করে দেবেন।'
(সহিহ মুসলিম-৬৬৮)

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের ওয়াজিব বলতে ঐ সব করণীয় বিষয় বোঝায়, যার কোনো একটিও ভুলক্রমে বাদ গেলে 'সাহু সিজদা' আদায় করতে হয়।
সালাতের ওয়াজিব অনেক, এর মধ্যে অন্যতম হলো ১৪ টি। যথা–
১। ফরজ সালাতের প্রথম দুই রাকাতে এবং বেতের, সুন্নত ও নফল সালাতের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ;
২। সুরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো ;
৩। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ;
৪। দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ;
৫। তিন ও চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতে দুই রাকাতের পর বসা ;
৬। প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ;
৭। ইমামের জন্য কিরাআত ওয়াক্ত অনুযায়ী আস্তে এবং জোরে পড়া ;
৮। বেতেরের সালাতে দোআয়ে কুনুত পড়া ;
৯। দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় অথবা বারো তাকবির বলা ;

১০। ফরয সালাতে প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারিত করা ;

১১। প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলোর তারতিব ঠিক রাখা ;

১২। প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলোর তারতিব ঠিক রাখা ;

১৩। 'তাদিলে আরকান' অর্থাৎ রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো, বসায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা এবং

১৪। সালাম বলে সালাত শেষ করা।

সালাতের সুন্নতসমূহ

সালাতের সুন্নতে মুয়াক্কাদা ১৬টি। যথা–

১। তাকবিরে তাহরিম বলার পূর্বে পুরুষের কানের লতি এবং মহিলার কাঁধ পর্যন্ত দুহাত উঠানো ;

২। তাকবিরে তাহরিমা বলেই পুরুষের নাভির নিচে এবং মহিলার বুকের উপর হাত বাঁধা ;

৩। তাকবিরে তাহরিমার সময় মস্তক অবনত না করা ;

৪। ইমামের জন্য তাকবির উচ্চস্বরে বলা ;

৫। সানা পড়া ;

৬। প্রথম রাকাতে সানার পর أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া ;

৭। প্রত্যক রাকাতে সুরা ফাতেহার পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়া ;

৮। সুরা ফাতেহার শেষে আমিন বলা ;

৯। ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা পড়া ;

১০। সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও আমিন আস্তে পড়া ;

১১। প্রত্যেক উঠা বসায় اَللهُ أَكْبَرُ বলা ;

১২। রুকুর তাসবিহ পড়া ;

১৩। রুকু থেকে উঠার সময় سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ পড়া ;

১৪। সিজদার তাসবিহ পড়া ;

১৫। দরুদ শরিফ পড়া এবং

১৬। দোআ মাসুরা পড়া।

সালাতে যে সব কাজ মাকরুহ

১। সালাতে এদিক-সেদিক তাকানো ;

২। সালাতে আকাশের দিকে তাকানো ;

৩। পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত আদায় করা ;

৪। খাওয়া সামনে নিয়ে সালাত আদায় করা ;

৫। সিজদায় দুই হাতের কনুই বিছিয়ে দেওয়া ;

৬। এমন কিছুর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা, যার দ্বারা মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে ;

৭। কাপড়, রুমাল ইত্যাদি গলায় ঝুলিয়ে সালাত আদায় করা ;

৮। ঘুমের চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা ;

৯। সালাতের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারণ ;

১০। কোনো সুরাকে বিশেষভাবে কোনো সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা এবং

১১। সালাতের মধ্যে আঙুল মটকানো অথবা এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করানো।

সালাতে দাঁড়ানোর নিয়ম

সালাতে দাঁড়ানো ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

অর্থ : তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। (সূরা বাকারা, ২৩৮)

কেউ যদি দাঁড়াতে অক্ষম হয় তবে সে বসে বসে সালাত আদায় করবে। যদি বসতেও অক্ষম হয় তাহলে শুয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে।

সালাতে কিবলামুখী হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দুই পায়ের পাতা সমানভাবে রাখতে হবে। স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানোতে দুই পায়ের মাঝে যতটা ফাঁকা থাকে, সালাতেও ততটুকু ফাঁকা রাখতে হবে।

রুকু থেকেও পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। অর্ধেক দাঁড়িয়ে ঝুঁকে আবার সেজদায় চলে গেলে ওয়াজিব তরক হবে।

বসে সালাত আদায় করার বিধান

ফরয, ওয়াজিব, ফযরের সুন্নত ও দুই ইদের সালাতে দাঁড়ানো ফরয। তবে শারীরিক অসুস্থতা বা দাঁড়ানোর সুযোগ না থাকলে বসে সালাত আদায় করতে হয়। চেয়ারে বসে সালাত আদায় করতে হলে রুকুতে একটু ঝুঁকে তাসবিহ পড়তে হবে, সিজদাতে আরও একটু অধিক ঝুঁকে সিজদার তাসবিহ পড়তে হবে। সমান স্থানে বসে সালাত আদায় করলে সামনে শক্ত কিছু রেখে তাতে সিজদা করা যাবে। যদি শক্ত কিছু পাওয়া না যায় তবে যমিনে সিজদা দেওয়া সম্ভব হলে সিজদা দিতে হবে আর সম্ভব না হলে রুকুতে যতটুকু ঝুঁকবে সিজদায় আরো অধিক ঝুঁকে সিজদার তাসবিহ আদায় করবে।

শারীরিক দুর্বলতার কারণে যদি এক রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করার পর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না হয় তাহলে বাকি সালাত বসে আদায় করা যাবে। বসে সালাত আদায় শুরু করে শরীরে শক্তি অনুভব করলে বাকি সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে হবে।

রুকু সিজদার নিয়ম ও দোআ

(ক) রুকু : স্ত্রীলোকের রুকু করার নিয়ম এই যে, বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের আঙুলগুলো যুক্ত অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর স্থাপন করবে এবং হাতের বাজু ও কনুই শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। অধিকাংশ ইমাম ও আলেম বলেছেন, স্ত্রী লোকও পুরুষের আর পুরুষ দুই পা স্বাভাবিকভাবে খাড়া রাখবে। মাথা, পিঠ এবং নিতম্ব বরাবর রাখবে। দুই হাতের মতই রুকু করবে। আঙ্গুলি দ্বারা দুই হাটু শক্ত করে ধরবে। হাতের বাজু ও কনুই শরীর থেকে পৃথক রাখবে। রুকুতে তাসবিহ তিনবার পড়া মুস্তাহাব। রুকুর তাসবিহ নিম্নরূপ–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

রুকুর চিত্র

(খ) সিজদা : রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর সোজা সিজদায় যেতে হবে। প্রথমত: হাঁটু তারপর হাতের পাতা রেখে দুই পাতার মাঝখানে মাথা নাক ও কপাল মাটিতে রাখবে এবং দুই পায়ের আঙুল কিবলামুখী করে মাটিতে রাখবে। পুরুষ উভয়পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। মাথা হাঁটু হতে দূরে, হাতের কব্জি মাটি হতে উপরে এবং পায়ের নলা উরু হতে বিচ্ছিন্ন রাখবে। মহিলাগণ পায়ের পাতা খাড়া না রেখে উভয় পাতা ডান দিকে যমিনে শোয়াবে, যথাসম্ভব কিবলামুখী করে হাত, পা ও পেট তথা সর্বাঙ্গ মিলিত করে রাখবে। অধিকাংশ ইমাম ও আলেমের মতে, পুরুষ ও মহিলা একই নিয়মে সিজদা করবে। সিজদাতে তাসবিহ তিন বার পড়া মুস্তাহাব। সিজদার তাসবিহ নিম্নরূপ –

سُبْحَانَ رَبِّـىَ الْأَعَلٰى

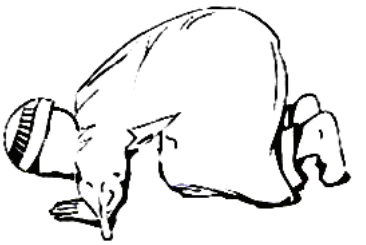

সালাতে বসার নিয়ম

সালাতে পুরুষগণ বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে আঙ্গুলগুলোর মাথা কিবলামুখী করে রাখবে।

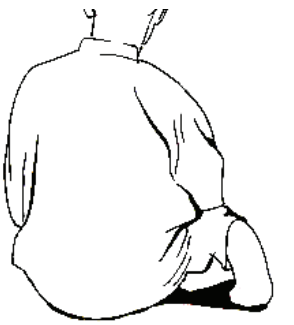

সালাম ফিরানোর বিধান

সালাত শেষে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাত শেষ করা ওয়াজিব। সালাম ফিরানোর সময় ইমাম সাহেবকে সকল মুসল্লির দিকে খেয়াল করতে হবে। যদি কেউ সালাত শেষে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ' না বলে দুনিয়ার কোনো কথা বলে বা এমনি উঠে চলে যায়, তবে তার ওয়াজিব তরক হবে। ফরয আদায় হয়ে যাবে কিন্তু ওয়াজিব পালন না করায় ঐ সালাত আবার আদায় করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. সালাত ইসলামের কততম স্তম্ভ?

ক. দ্বিতীয় খ. তৃতীয়

গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম

২. নিচের কোনটি সালাতের ওয়াজিব?

ক. কিরাআত পড়া খ. রুকু করা

গ. তাশাহহুদ পড়া ঘ. কিয়াম করা

৩. সালাতের সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ কয়টি?

ক. ১০ খ. ১২

গ. ১৪ ঘ. ১৬

৪. নিয়মিত সালাত আদায়ের মাধ্যমে–

i. গুনাহ-খাতা দূর হয়

ii. জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়

iii. আল্লাহর হুকুম পালন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫. নামাজ কোন ভাষার শব্দ?

ক. আরবি

খ. ফার্সি

গ. উর্দু

ঘ. সংস্কৃত

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। اَلصَّلٰوۃ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। সালাতের মধ্যে قِيَامٌ এর গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২। সিজদার মধ্যে পঠিত তাসবিহ অর্থসহ লেখ।

৩। সালাতের গুরুত্ব ও উপকারিতা কুরআন সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করো।

৪। সালাতে সালাম ফেরানোর বিধান বর্ণনা করো।

দ্বিতীয় পাঠ
সালাতের কিরআত
اَلْقِـرَاءَةُ فِـى الصَّلَاةِ

কিরাতের পরিচয় ও হুকুম

কিরাত (اَلْقِرَاءَة) অর্থ পাঠ করা। ব্যবহারিক অর্থে সালাতে পবিত্র কুরআন পাঠ করাকে কিরাত বলা হয়। সুতরাং اَلْقِرَاءَةُ فِى الصَّلَاةِ–এর অর্থ হলো, সালাতে কুরআন মাজিদ পাঠ করা।

কুরআন মাজিদের সূরাগুলো যে তারতিব বা ক্রমানুসারে লেখা আছে, সালাতের মধ্যে উক্ত তারতিব অনুসারেই পাঠ করতে হবে। জেনে বুঝে পরের সুরা আগে এবং আগের সুরা পরে পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ। সালাতের মধ্যে সব সময় একই সুরা নিদিষ্ট করে না পড়া ভালো। বিনা ওযরে একই সূরার কয়েক জায়গা থেকে কয়েক আয়াত পড়া উচিত নয়।

সালাত যেমন ফরয, সালাতে কিরাত পড়াও ফরয। তাই কিরাত বিশুদ্ধভাবে পড়তে জানাও ফরয। তেলাওয়াত সহিহ শুদ্ধ না হলে সালাত শুদ্ধ হবে না। সালাত বাতিল হয়ে যায়।

যে সকল ভুলের কারণে অর্থের বিকৃতি ঘটে, এ ধরনের ভুলকে لَحْـنٌ جَـلِىٌّ (প্রকাশ্য বা বড় ভুল) বলে। সালাতের যে কোনো পর্যায়ে لَحْنٌ جَلِىٌّ হয়ে গেলে, সালাত বাতিল হয়ে যায়।

অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতকারী সম্পর্কে রসুল (ﷺ) বলেন–

رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنَ وَالْقُرْانُ يَلْعَنُه

অর্থ : অনেক কুরআন তিলাওয়াতকারী রয়েছে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করে, আর কুরআন তাদেরকে লানত করে। (মুসতাদরাক লিল হাকেম-২৫৬৪)

কিরাআতের পরিমাণ

সালাতের মধ্যে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ পাঠ করা ওয়াজিব। জামাআতে সালাত আদায়কালে ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাআত পাঠ করা ফরয নয়।
কেননা রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

অর্থঃ যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাতই তার কিরাত। (ইবন মাজাহ-৮৫০)

তৃতীয় পাঠ

কাযা সালাত

صَلَاةُ الْقَضَاءِ

কাযা সালাতের পরিচয়

কাযা (قَضَاء) শব্দের অর্থ পূর্ণ করা। পরিভাষায় ফরয বা ওয়াজিব সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আদায় করাকে কাযা সালাত বলা হয়। সালাত কাযার বিষয়ে মূল কথা হলো, একজন মুমিন কোন অবস্থাতে ইচ্ছাপূর্বক সালাত ত্যাগ করতে পারে না। সালাত বিশেষ কারণে বাদ যেতে পারে। রাসুল (সা.) সালাত পড়তে না পারার দুটি মাত্র কারণ উল্লেখ করেছেন। একটি হলো ভুলে যাওয়া, অপরটি হলো ঘুম। এ দুটি কারণে সালাত আদায় করতে না পারলে করণীয় কী এ বিষয়ে রাসুল (সা.) সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ "وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي"

অর্থ : যে লোক কোনো সালাত ভুলে যাবে সে যেন পড়ে নেয় যখনই তা স্মরণ হয়। এটি তথা স্মরণ সাথে সাথে সালাত আদায় করে নেওয়া ছাড়া আর কোনো কাফফারা নেই। কুরআন মাজিদে ইরশাদ করা হয়েছে,"সালাত কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য।" (সহিহ বুখারি, ৫৯৭)

অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে–

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ "كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا"

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এমন ব্যক্তি সমন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে বা সালাত সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে যায়। তিনি বললেন, এর কাফফারা হলো যখনই স্মরণ হবে, তখনই তা পড়ে নিতে হবে। (সুনানু নাসায়ি-৬১৪)

ইচ্ছা করে সালাত না পড়ার কোনো সুযোগ নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে না পড়া সালাত আদায় করার বিষয়ে রাসুল (ﷺ) থেকে সুস্পষ্ট কোনো বিধান নেই।

সফরকালীন সময়ের কাযা সালাত মুকিম অবস্থায় আদায় করলে কসর আদায় করতে হবে। অনুরূপ মুকিম অবস্থায় কাযা সালাত সফরে পড়লে পূর্ণই পড়তে হবে।

সালাত আদায় করতে না পারার কারণ

একজন মুমিনের ইচ্ছা করে সালাত বাদ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। দুটি মাত্র কারণে সালাত আদায় অক্ষম হতে পারে। সেগুলো হলো

১। ঘুমিয়ে থাকা : কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে এবং ওয়াক্ত চলে যাবার পর তার ঘুম ভাঙ্গে, তার এই সালাতের কাযা আদায় করা ফরয।

২। সালাতের কথা ভুলে যাওয়া : কেউ যদি সালাতের কথা একেবারে ভুলে যায় এবং পরে মনে পড়ে তাহলে তার এ সালাতেরও কাযা আদায় করা ফরজ।

মৃত ব্যক্তির কাযা সালাতের কাফ্ফারা

এটি আমাদের দেশে প্রচলিত একটি বিষয়। ঘুম অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে সালাত আদায় করতে না পারলে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেই সালাত আদায় করতে হবে। ভুলে যাওয়ার কারণে সালাত আদায় করতে না পারলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সালাত আদায় করতে হবে এটিই পড়তে না পারা সালাতের কাফ-ফারা। যেমন রাসুল (ﷺ) ভুলে যাওয়া সালাত সম্পর্কে বলেছেন, 'যে সালাত ভুলে যাবে, সে যেন যখনই স্মরণ হয় তখনি তা পড়ে নেয়। এটিই এর কাফফারা। 'ঘুমের কারণে না পড়া সালাত সম্পর্কে বলেছেন এ সালাতের কাফফারা আদায় করে নেয়া। মৃত ব্যক্তির না পড়া সালাতের কাযা বিষয়ে সহী এমনকি দুর্বল হাদিসেও কোনো নির্দেশনা নেই।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. সালাতে কেরাত পড়ার বিধান কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. কোন সালাতের কাযা পড়তে হয় না?

ক. ফরজের

খ. বেতেরের

গ. মানতের

ঘ. নফলের

৩. قَضَاء শব্দের অর্থ কী?

ক. ফয়সালা করা

খ. নির্ধারিত করা

গ. পূর্ণ করা

ঘ. বারবার করা

৪. সালাত কাযা করা জায়েয, যদি -

i. মুসাফির শত্রুর ভয় করে

ii. মানুষ অসুস্থ হয়

iii. ধাত্রী কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৫. اَلْقِرَاءَةُ فِى الصَّلاَةِ-এর অর্থ-

ক. সালাতে কুরআন মাজিদ পাঠ করা

খ. সালাতে কুরআন মাজিদ পাঠ শুনানো

গ. সালাতে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত শুনা

ঘ. সালাতে কুরআন মাজিদ শুনা

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। সালাতে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের বিধান কী? আল-কুরআনের আলোকে বর্ণনা করো।

২। صَلَاةُ الْقَضَاءِ-এর পরিচয় দাও। صَلَاةُ الْقَضَاءِ-এর পদ্ধতি স্পষ্টভাবে আলোকপাত করো।

৩। সালাত পড়তে না পড়ার কারণ কী কী? হাদিসের আলোকে বর্ণনা করো?

চতুর্থ পাঠ

সালাতুল বেতের

صَلَاةُ الْـوِتْـرِ

সালাতুল বেতেরের পরিচয়

বিতর (وِتْر) শব্দের অর্থ বেজোড়, একক, সঙ্গীবিহীন। সালাতুল বিতরকে এজন্য বিতর বলা হয় যে, এই সালাতের রাকাত সংখ্যা বেজোড়। ইশা বা রাতের সালাতের পর সর্বশেষ যে বেজোড় সালাত আদায় করা হয়, তাকে সালাত বলে।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : বিতর সালাত সত্য, যে লোক বিতরের সালাত আদায় করবে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (আবু দাউদ)

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

أَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

অর্থ : তোমরা বিতরের সালাত আদায় করো, কেননা আল্লাহ তাআলা বিতর তথা বেজোড় (একক) এবং তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।

বিতরের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। বেতেরের সালাত ছেড়ে দিলে গুনাগার হবে। কোনো কারণ বশত বিতরের সালাত ছুটে গেলে এর কাযা আদায় করতে হবে। রমযান মাসে তারাবিহ সালাত আদায়ের পর জামাআতবদ্ধভাবে বেতেরের সালাত আদায় করা যায়।

বিতরের রাকাত সংখ্যা

বেতেরের সালাত স্বভাবত তিন রাকাত।

আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِـىْ اٰخِرِهِنَّ

অর্থ : রাসুল (ﷺ) তিন রাকাত বিতর সালাত আদায় করতেন এবং একেবারে শেষ রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

তবে একাধিক সহী হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, বিতরের সালাত পাঁচ রাকাত, সাত রাকাত, নয় রাকাতও পড়া যায়।

বিতর আদায়ের উত্তম সময় ও বৈধ সময়

হজরত জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবি (ﷺ) বলেছেন, যার শেষরাতে জাগ্রত না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সে যেন প্রথম রাতেই বেতের সালাত আদায় করে নেয়। আর যার শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার অভ্যাস আছে, সে যেন শেষ রাতেই বেতের আদায় করে। কেননা শেষ রাতের সালাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন। আর এটাই হলো উত্তম। (সহিহ মুসলিম)

দোআ কুনুত

বেতের সালাতে দোআ কুনুত পড়তে হয়। এ কুনুত তিন রাকাত বিতর সালাতের শেষ রাকাতে কিরাত পড়ার পর তাকবির বলে রুকুতে যাওয়ার আগে পড়তে হয়। রুকুর পরও দুয়া কুনুত পড়া যায়। ওমর (রাদি) সহ একাধিক সাহাবী থেকে প্রমাণিত যে, তাঁরা রুকুর পর দুয়া কুনুত পড়তেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

إِنَّ النَّبِـيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) রুকু করার পূর্বে দোআ কুনুত পড়তেন। (আদদারাকুতনি)

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন–

قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ.

অর্থ : রাসুলে করিম (ﷺ) বিতর সালাতের শেষ রাকাতে দোআ কুনুত পাঠ করেছেন।

দোআ কুনুত নিম্নরূপ–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُوَ إِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ

نَخْشٰى عَذَابَكَ. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

২০২১

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনারই সাহায্য প্রার্থী এবং একমাত্র আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থী। আপনার উপর আমরা ইমান এনেছি এবং আপনার উপরই ভরসা রাখি। আমরা আপনার উত্তম প্রশংসা করি, আপনার শুকরিয়া আদায় করি। যারা আপনার নাফরমানি করে তাদেরকে পরিত্যাগ করছি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্যই সালাত আদায় করি এবং আপনার উদ্দেশ্যেই সাজদা করি, আপনার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই, আপনার হুকুম পালনের জন্যই প্রস্তুত থাকি, আপনার দয়ার আশা করি, আপনার শাস্তিকে ভয় পাই। নিঃসন্দেহে আপনার শাস্তিভোগ করবে কাফির সম্প্রদায়।

আমাদের দেশে এটিই দোআ কুনুত হিসেবে পরিচিত ও প্রচলিত। এছাড়া আরো দোআ কুনুত আছে। যেমন-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়াত দিয়েছ, তাদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে হেদায়াত দাও। যাদেরকে সুস্থতা দিয়েছ, তাদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে সুস্থতা দাও। তুমি যাদের অভিভাকত্ব গ্রহণ করেছ, তাদের অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে অভিভাকত্ব গ্রহণ কর। আমাকে যা দিয়েছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যা নির্ধারণ করেছ, তার অনিষ্ঠ থেকে আমাকে রক্ষা কর। তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। তোমার বিপরীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। তুমি যার অভিভাকত্ব গ্রহণ করেছ সে অপামানিত হয় না। যার প্রতি তোমার শত্রুতা সে সম্মানিত হয় না। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময় এবং তুমি উচ্চতায় রয়েছ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. বিতরের সালাত কয় রাকাত?

ক. এক খ. তিন

গ. পাঁচ ঘ. সাত

২. বিতরের সালাতে দোআ কুনুত পড়ার হুকুম কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩. বিতরের সালাত আদায় করতে হয়, কারণ ইহা -

i. আদায় করা ওয়াজিব

ii. অত্যধিক ফযিলতপূর্ণ

iii. আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

৪. وِتْر শব্দের অর্থ–

ক. বেজোড় খ. ভিন্ন

গ. আলাদা ঘ. পৃথক

৫. বিতরের সালাত কখন পড়তে হবে?

ক. এশার সালাতের পরে

খ. মাগরিবের সালাতের পর

গ. নফল সালাতের পর

ঘ. তাহাজ্জুদের সালাতের পর

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। وِتْر শব্দের অর্থ কী? সালাতুল বেতের বলতে কী বুঝ? বর্ণনা দাও।

২। যে কোনো একটি দোআ কুনুত অনুবাদসহ লেখ।

৩। সালাতুল বিতর আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা দাও।

পঞ্চম পাঠ
জানাজা সালাত
صَلَاةُ الْـجَنَازَةِ

জানাজা সালাতের পরিচয়

জানাজা (اَلْجَنَازَة) শব্দের অর্থ হলো লাশ। صَلَاةُ الْجَنَازَةِ বা জানাজার সালাত অর্থ হলো মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ প্রকারের সালাত। জানাজার সালাত ফরজে কেফায়া (فَرْضُ كِفَايَةٌ)। কিছু সংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলেই সকলের ফরজ আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে সকলে গুনাহগার হয়।

জানাজা সালাতে ফরয দুইটি। যথা–

(১) তাকবির বা আল্লাহু আকবার চার বার বলা ও

(২) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।

এই সালাতে রুকু ও সিজদা নেই। ওজর ব্যতীত জানাজার সালাত বসে পড়া জায়েয নয়। কোনো কিছুর উপর উঠে সালাত আদায় করাও জায়েয নয়।

জানাজার ওয়াজিব একটি : চতুর্থ তাকবির বলার পর সালাম ফিরানো।

জানাজা সালাতে সুন্নত তিনটি। যথা–

(১) আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পড়া;

(২) নবি করিম (ﷺ)-এর উপর দরুদ শরিফ পড়া;

(৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ করা।

মৃত ব্যক্তি যেহেতু আমল করতে পারে না তাই তার জন্য যত বেশি পারা যায় দোআ করা প্রয়োজন। জানাযা সালাতের আগে ও জানাজার পরে, কবরে রেখে যত বেশি তার জন্য দোআ করা যাবে ততই মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে। জানাজা সালাতের পর দোআ করার ক্ষেত্রে হাদিসে ও শরিয়তে নিষেধ করা হয়নি। তবে অবশ্যই এই দোয়া হবে ব্যক্তিগতভাবে সামষ্টিকভাবে নয়।

জানাজার সালাতে তাকবির সংখ্যা

জানাজার সালাতে তাকবির সংখ্যা চারটি। প্রত্যেকটি তাকবির এক রাকয়াত সালাতের স্থলাভিষিক্ত। এ সালাতে রুকু সাজদা নেই। প্রথম তাকবিরের পর সানা পাঠ করবে। অনেক ইমাম ও আলিমের মতে প্রথম তাকবিরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। দ্বিতীয় তাকবিরের পর দরুদ পাঠ করবে। তৃতীয় তাকবিরের পর দোআ পাঠ করবে। চতুর্থ তাকবিরের পর সালাম ফিরাবে।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন

صَلُّوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ أَوِالنَّهَارِ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَ الذَّنِيِّ وَ الْأَمِيْرِ أَرْبَعًا.

অর্থ : তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর জানাজার সালাত আদায় কর, রাতে কিংবা দিনে, সে ছোট হোক বা বড়, ধনী হোক বা গরিব, চার তাকবির সহকারে। (মু'জামুল আওসাত)

হজরত জাবির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত–

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

নবি করিম (ﷺ) নাজ্জাশি বাদশাহ আসহামা এর জানাজার সালাত চার তাকবিরের সাথে আদায় করেছেন। (সহিহ বুখারি)

দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর ধরে মক্কা মুকাররমা ও মদিনা তয়্যিবায় চার তাকবিরে জানাজা সালাত আদায় হয়ে আসছে।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি

একটি চওড়া তক্তা বা খাটের চতুর্দিকে ৩, ৫ বা ৭ বার লুবান অথবা আগরবাতি দিয়ে ধোঁয়া দিতে হবে। তারপর তক্তার উপরে রেখে পরিধানের সমস্ত কাপড় চোপড় ইত্যাদি খুলে ফেলতে হবে শুধু নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবে। যদি গোসলের পানি অন্য দিকে গড়িয়ে যাওয়ার রাস্তা না থাকে, তবে খাটের নিচে একটি গর্ত করতে হবে যেন পানি সেখানে জমা হয়।

গোসল দানকারীর হাতে নেকড়া পেঁচিয়ে প্রথমে ঢিলা দ্বারা পরে পানি দ্বারা ইসতিনজা করাতে হবে। সাবধান লজ্জাস্থান খালি হাতে স্পর্শ, অথবা দর্শন করবে না। তারপর অজুর অঙ্গগুলো অজুর নিয়মানুযায়ী ধোয়াবে। কিন্তু কুলি করানো বা নাকে পানি দেওয়া বা কব্জি পর্যন্ত ধৌত করার প্রয়োজন নেই। গোসলের পূর্বে নাক, মুখ, কানের ছিদ্র ও দাঁতের গোড়া তিনবার মুছে দিতে হবে।

যদি মৃত ব্যক্তি গোসল ফরজ অবস্থায় মারা যায়, তবে এভাবে মুছে দেওয়া ওয়াজিব। মাথার চুল এবং দাঁড়ি সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিবে। তারপর মুর্দাকে বাম কাতে শোয়ায়ে শরীরের উপর মাথা হতে পা পর্যন্ত বরই পাতাসহ সহ্যমত গরম পানি দ্বারা ৩ থেকে ৫ বার পানি ঢেলে পরিষ্কার করে ধৌত করতে হবে। তারপর আবার ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্বেও এরূপে ৩ থেকে ৫ বার পানি ঢেলে ধুতে হবে।

এরূপে গোসল হয়ে গেলে, গোসল দানকারী মুর্দাকে নিজ শরীরের সহিত টেক লাগিয়ে কিঞ্চিত উঁচু করে বসাবে এবং আস্তে আস্তে তার পেটের উপর মালিশ করবে। তাতে পেট হতে যদি কিছু ময়লা বের হয়, তবে কুলুখ করিয়ে শুধু ময়লাটুকু ধুয়ে দিবে। অজু-গোসল দোহরাতে হবে না। যদি সম্ভব ও সহজ হয়, তবে মুর্দাকে বাম কাতে শোয়াবে এবং কর্পূরের পানি মুর্দারের মাথা হতে পা পর্যন্ত তিনবার ঢালবে। তারপর শুকনা কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ভালো করে মুছে দিবে। তারপর কাফন পরাবে। ৩ –৫ বারের পরিবর্তে এক বার ধুলেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে। মুর্দাকে কাফনের উপর রাখার সময় স্ত্রীলোকের মাথায়, পুরুষের মাথায় ও দাড়িতে আতর লাগাবে এবং কপাল, নাক, হাতের তালু, হাঁটু ইত্যাদি সাজদার জায়গায় কর্পূর লাগাবে। অনেকে কাফনে, কানে শরীরে আতর লাগায়, তা করবে না। মুর্দার চুল আঁচড়াবে না, নখ কাটবে না।

পুরুষদের গোসল পুরুষগণ এবং মহিলাদের গোসল মহিলাগণ করাবে। পুরুষের গোসলের জন্য পুরুষ না পাওয়া গেলে, তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো মুহরিম স্ত্রীলোক গোসল দিতে পারবে না। কিন্তু মৃত স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করতে পারবে না। তবে শুধু দেখা ও কাপড়ের উপর দিয়ে হাত লাগানো দুরস্ত হবে। কোনো অপবিত্রা মহিলা মুর্দাকে গোসল দিতে পারবে না। যে অধিক নিকটতম আত্মীয় তার গোসল দেওয়া উচিত।

কাফন পরিধান

পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত। তা হলো– (১) চাদর, (২) ইযার, (৩) কোর্তা।

আর মেয়েদের জন্য উপরোক্ত তিনখানা ছাড়া আরও দুই খানা অতিরিক্ত কাপড় লাগবে। তা হলো–

(৪) সেরবন্দ, (৫) সিনাবন্দ।

(১) চাদর : শরীরের মাপ থেকে এক হাত বেশি নিতে হবে।

(২) ইযার : মাথা হতে পা পর্যন্ত লম্বা। মাপ সমান নিতে হবে।

(৩) কোর্তা : লম্বায় মাইয়িতের মাপের দেড়গুণ হতে কিছু বেশি নিতে হবে, যাতে দ্বিগুণ করলে, নিসফে ছাক্ব (অর্ধগোছা) পর্যন্ত হয়। কোর্তার জন্য মধ্যখানে শুধু ফেড়ে ঢুকাতে পারলেই হবে। আস্তিন ও কল্লির প্রয়োজন নেই।

(৪) সেরবন্দ : ১২ গিরা চওড়া, তিন হাত লম্বা।

(৫) সিনাবন্দ : ১২ গিরা চওড়া (বগলের নিচ থেকে রান পর্যন্ত পাশ হবে), তিন হাত লম্বা। স্বাস্থ্যবান হলে লম্বা বেশিও লাগতে পারে।

পুরুষের কাফন পরানোর নিয়ম

প্রথমে চাদর, পরে ইযার, তারপর কোর্তা পিঠের অংশ বিছিয়ে সামনের অংশ মাথার কাছে গুছিয়ে রাখবে। তারপর কাফনে তিন বা পাঁচ বেজোড় আগরবাতি লোবানের ধোঁয়া দ্বারা ধুমায়িত করবে। তারপর মৃতব্যক্তিকে কাফনের উপর রেখে প্রথমে মাথার উপর দিয়ে কোর্তা গলায় প্রবেশ করাবে শরীর ঢেকে ঢাকনির চাদর খুলে ফেলবে। তারপর ইযার প্রথমে বামপাশ তারপর ডানপাশে দিয়ে ঢেকে দিবে। তারপর উপরোক্ত নিয়মে চাদর দিয়ে ঢেকে দিবে। সর্বশেষে কাপড়ের আঁচল অথবা মোটা সুতা দ্বারা মধ্যখান, পায়ের দিক ও মাথার দিক বেঁধে দিবে। যাতে খুলে না যায়। তবে কবরে নামিয়ে বাঁধন খুলে দিতে হবে।

নারীর কাফন পরানোর নিয়ম

প্রথমে চাদর, পরে ইযার, তারপর সিনা বরাবর সিনাবন্দ বিছাবে। তারপর কোর্তার নিচের অংশ বিছিয়ে উপরের অংশ মাথার কাছে গুছিয়ে রাখবে। তারপর মাইয়্যিতকে এনে কাফনের উপর শোয়াবে। কোর্তার সামনের অংশ মাথা দিয়ে গলায় ঢুকায়ে পরায়ে দিবে। ঢাকনির চাদর খুলে ফেলবে। মাথার চুল ভাগ করে দু-পাশ দিয়ে এনে কোর্তার উপরে বক্ষের উপর রেখে দেবে। তারপর সেরবন্দ দ্বারা মাথা পেঁচিয়ে মুখ খোলা রেখে চুলের উপর রেখে দিবে। তারপর সিনাবন্দ দুই পাশ থেকে বামপাশে প্রথমে উঠিয়ে ডানপাশ দিয়ে পেঁচিয়ে দিবে। তারপর ইযারের বামপাশ উঠায়ে ডানপাশ দিয়ে পেঁচিয়ে দিবে। তারপর চাদর উক্ত নিয়মে পেঁচাবে। তারপর দু'মাথা এবং মধ্যখানে বেঁধে দিবে। তবে কবরে নামিয়ে তা খুলে দিতে হবে।

সালাতুল জানাজা পড়ার নিয়ম

জানাজার সালাতের নিয়ম হলো, প্রথম তাকবিরে (তাকবিরে তাহরিমা) হাত কান পর্যন্ত তুলবে, পরের তাকবিরগুলোতে হাত বাধা অবস্থায় থাকবে। ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে দুহাত ছেড়ে দিবে।

জানাজার সালাতে কমপক্ষে তিন কাতার করা সুন্নত। মৃতকে কিবলার দিকে সম্মুখে রেখে বক্ষ বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন।

প্রথম তাকবির (তাকবিরে তাহরিম)-এর পর সানা পড়তে হবে। সানা নিম্নরূপ–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ جَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا إِلٰـهَ غَيْرُكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার, আপনি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত, আপনার নাম বরকতপূর্ণ, আপনার মহত্ত্ব অতি বিরাট, আপনার প্রশংসা অতি মহত্ত্বপূর্ণ এবং আপনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

অনেক ইমাম ও আলিমের মতে প্রথম তাকবিরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

সানা বা সূরা ফাতিহা পড়ার পর দ্বিতীয় তাকবির উচ্চারণ করে দরুদে ইবরাহিমী পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ. إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অতঃপর তৃতীয় তাকবির উচ্চারণ করে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-নারীর জন্যে নিম্নের দোআটি পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِـحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَـنَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ-নারী সকলের গুনাহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যাদের জীবিত রাখবেন তাদের ইসলামের উপর রাখুন, আর যাদের আপনি মৃত্যু দেবেন, ইমানের সাথে মৃত্যু দিন।

পূর্ণ বয়স্ক লোকের জানাজা হলে, ইমাম সাহেব সশব্দে আর মুক্তাদি চুপে-চুপে, তৃতীয় তাকবির বলে (হাত না ছেড়ে) উক্ত দোআ পড়বেন।

নাবালেগ ছেলের জানাজা হলে তৃতীয় তাকবিরের পর নিম্নোক্ত দোআ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا.

নাবালেগ মেয়ের জানাজা হলে তৃতীয় তাকবিরের পর নিম্নোক্ত দোআ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَ اجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً.

চতুর্থ তাকবিরের পর সালাম বলতে হবে– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ

চতুর্থ তাকবিরের পর (হাত না উঠিয়ে) ইমাম সাহেব সশব্দে আর মুক্তাদি চুপে চুপে চতুর্থ তাকবির বলে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাতুল জানাজা শেষ করবে।

সালাতুল জানাজার পর দোআর বিধান

একজন মানুষ ইন্তিকাল করার পর তার জন্য সব সময় দোআ করাই উত্তম। সালাতুল জানাযাও মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ। তবে তার মধ্যে নামাযের সাদৃশ্য যেমন আছে, দোআও আছে। বিগলিত মনে দোআ করা কর্তব্য। দোআ করলে মৃত ব্যক্তির জন্য ফায়দা রয়েছে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (﵁) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জানাজার সালাত পড়ার পর খালেসভাবে তাঁর জন্য দোআ করবে। (সুনানু আবু দাউদ)

হজরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (﵁) এক ব্যক্তির জানাজার সালাতে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করেন। কিন্তু সালাতে শরিক হতে পারেননি। অতঃপর তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন–

إِنْ سَبَقْتُمُوْنِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالدُّعَاءِ

অর্থ : তোমরা জানাযার সালাত আদায় করে ফেলেছ, কিন্তু আমার পূর্বে দোআ করো না। অর্থাৎ আমাকে সাথে নিয়ে দোআ কর। (সারাখসী, আল মাবসূত)

ইন্তিকালের পর মৃতব্যক্তির আমল করার আর সুযোগ থাকে না। তার নেক সন্তান তার জন্য দোআ করলে, তাতেই সে লাভবান হবে। সন্তানের এ দোআর জন্য সময় বেধে দেওয়া নেই। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে যখনই সুযোগ হয় পিতা-মাতাসহ সকল মুমিন মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দোআ করা কর্তব্য। তবে এ দুয়া হবে ব্যক্তিগতভাবে, সামষ্টিকভাবে নয়।

মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ

যারা জীবিত আছেন, তাদের উচিত, তাদের পূর্বসূরী যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের জন্য দোআ করা। বিশেষ করে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও ওস্তাদ যারা কবরবাসী হয়েছেন, তাদের মাগফিরাতের জন্য সর্বদা দোআ করা কর্তব্য। এটা জীবিত

ব্যক্তির উপর মৃতব্যক্তির হক বা অধিকার। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার জন্য কিভাবে দোআ করতে হবে পবিত্র কুরআনে সে বিষয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের (পিতা-মাতা) প্রতি এমনিভাবে দয়া করুন, যেমনিভাবে তারা উভয়ে আমার প্রতি শিশুকালে দয়া করেছিলেন। (সূরা বনি ইসরাইল, ২৪)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

অর্থ: যখন মানুষ মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে-

(১) সদকায়ে জারিয়া
(২) তার রেখে যাওয়া ইলম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হয়;
(৩) নেক ও যোগ্য সন্তান যে তার জন্য দোআ করে। (সহিহ মুসলিম-১৬৩১)।

দোআর পদ্ধতি

মৃতব্যক্তির জন্য দোআ করা জীবিতদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। হজরত সুফিয়ান সাওরি (রা) বলেন: জীবিত লোকেরা যেমন পানাহারের মুখাপেক্ষী অনুরূপ মৃত ব্যক্তিরা দোআর মুখাপেক্ষী। তাই মৃত ব্যক্তিদের জন্য সবসময় দোআ করতে হবে। এটা তাদের প্রতি জীবিতদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দোআর জন্য দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বিশেষ দিন ও সময় দোআ করলে তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। যেমন : জুমুআর দিনে, আরাফার দিনে, লাইলাতুল কদরে ইত্যাদি।

কবর যিয়ারতের সুন্নত পদ্ধতি

কবর যিয়ারত করা সুন্নত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মাঝে মধ্যে বাকী' কবরস্থানে যেতেন এবং কবর যিয়ারত করতেন।

কবর যিয়ারত করলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। তাতে মন নরম হয় এবং গুনাহের কাজ পরিত্যাগের আগ্রহ জন্মে এবং অন্তর দুনিয়ার মায়া মহব্বত ছেড়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত হয়।
রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قُبُوْرِ أُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ.

অর্থ : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, মুহাম্মদ (ﷺ)কে তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর; কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (জামে তিরমিজি-১০৫৪)

কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে নিম্নের দোআটি পড়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে সালাম করতে হয় –

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ، أَنْتُم لَنَا سَلَفٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمْ.

অর্থ : হে কবরস্থিত মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের পূর্বে গত হয়েছে। আমরা তোমাদের অনুসরণ করব এবং আল্লাহ চাইলে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের প্রতি রহম করুন ।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. জানাজার সালাত পড়া কী?

ক. ফরজ

খ. ফরজে কেফায়া

গ. ওয়াজিব

ঘ. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

২. জানাজার সালাতে সুন্নত কয়টি?

ক.৩ খ. ৪

গ. ৫ ঘ. ৬

৩. কবর যিয়ারতের হুকুম কী?

ক. সুন্নত

খ. ওয়াজিব

গ. মাকরুহ

ঘ. মুস্তাহাব

৪. মৃত্যুর পর মানুষের যে আমল জারি থাকে তা হচ্ছে –

i. সদকায়ে জারিয়া

ii. উপকারী ইলম

iii. নেক সন্তানের দোআ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫. اَلْجَنَازَة শব্দের অর্থ কী?

ক. খাট খ. কবর

গ. লাশ ঘ. মাটি

৬. জানাজার সালাতে তাকবিরের সংখ্যা কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৭. মৃত পুরুষের জন্য কয়টি কাপড় পরানো সুন্নাত?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৮. মৃত মহিলার জন্য কয়টি কাপড় পড়ানো সুন্নত?

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৬টি

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। কাফনে পুরুষের জন্য কয়খানা কাপড় দেয়া সুন্নত? মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি লেখ।

২। পিতা-মাতার জন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নির্দিষ্ট দোআটি অর্থসহ লেখ।

৩। নারী ও পুরুষের কাফন পরানোর নিয়মাবলি লেখ।

ষষ্ঠ পাঠ
নফল সালাত
صَلَاةُ النَّوَافِل

সালাতুল ইশরাক (صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ)

ইশরাক (اَلْإِشْرَاق) শব্দের অর্থ উদিত হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া ইত্যাদি।

শরয়ি পরিভাষায় সূর্য উদয় থেকে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অতিবাহিত হলে যে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করা হয়, তাকে ইশরাকের সালাত বলে।

ইশরাক সালাতের ফযিলত সম্পর্কে হজরত আনাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ.

অর্থ : যে ব্যক্তি জামাআত সহকারে ফজর সালাত আদায় করার পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার যিকির করে, এরপর দুরাকাত (নফল) সালাত পড়ে সে একটি হজ ও একটি ওমরার সওয়াব পাবে। আনাস (رضي الله عنه) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তিনবার বলেছেন: পরিপূর্ণ হজ ও ওমরার সওয়াব পাবে। (জামে তিরমিজি-৫৮৬)

সালাতুল আওয়াবীন (صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ)

সালাতুল আউয়াবিন (أَوَّابِـيْن) আদায় করা মুস্তাহাব। এ সালাতের সময় হলো- সূর্য উদয়ের পর জমিন এতটা উত্তপ্ত হবে যে উট শাবক তার তাপ অনুভব করবে। রসুল (ﷺ) বলেছেন,

صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ

অর্থ: আওয়াবীনের সালাতের সময় হলো যখন উট শাবকের পায়ে সূর্যের তাপ লাগে।
(সহিহ মুসলিম, ৭৪৮)

সালাতুল আওাবীনই সালাতুদ দোহা এবং সালাতদ দোহাই সালাতুল আওয়াবীন। রসুল (ﷺ) বলেছেন,

لَا يُحَافِظُ على صلاة الضُّحَى إِلَّا أَوَّاب وهى صلاة الْأَوَّابِيْنَ

অর্থ: 'আল্লাহমুখী লোকই সালাতুদ দোহায় নিয়মিত। আর এটিই সালাতুল আওয়াবীন।' (মুসতাদরাক : ১২২৩)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. সালাতুল ইশরাক আদায় করলে কিসের সওয়াব হয়?

ক. সাওম খ. হজ

গ. ওমরা ঘ. হজ ও ওমরা

২. সালাতুল আওয়াবিন কয় রাকাত আদায় করতে হয়?

ক. চার খ. ছয়

গ. আট ঘ. দশ

৩. সালাতুল আওয়াবিন আদায় করলে -

i. বার বছর ইবাদতের সমান সওয়াব হয়

ii. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়

iii. বিপদ-মুসিবত দূর হয়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৪. الإِشْرَاق শব্দের অর্থ কী?

ক. সকাল হওয়া খ. সুবহে সাদিক হওয়া

গ. দ্বিপ্রহর হওয়া ঘ. উজ্জ্বল হওয়া

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। الإِشْرَاق শব্দের আভিধানিক অর্থ ও পরিভাষিক সংজ্ঞা লেখ এবং صلاة الإشراق এর গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২। সালাতুল আওয়াবিন-এর সময় কখন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাওম

اَلصَّـوْمُ

প্রথম পাঠ

আহকামুস সাওম

সাওমের পরিচয়

সাওম (اَلصَّـوْم) আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। সাওমকে ফার্সি ভাষায় রোজা (روزه) বলা হয়।

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে সর্বপ্রকার পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকাকে, শরিয়তের পরিভাষায় সাওম বলে।

সাওমে শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা পায়। ক্ষুধার্ত অনাহারী মানুষের দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মিথ্যা অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায়।

সাওম এমন একটি ইবাদত যার অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাই এ বিশেষ ইবাদতের সওয়াব অনির্ধারিত। সাওম একমাত্র আল্লাহর জন্য, আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দিবেন। যেমন হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَ أَنَا أَجْزِيْ بِهِ.

অর্থ : সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।

আত্মিক পরিশুদ্ধি ও রিপুসমূহকে দমন করার জন্য এ সিয়াম সাধনা সর্বকালীন। হজরত আদম (ﷺ) থেকে সাওমের বিধান ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

সাওমের প্রকার

সাওম পাঁচ প্রকার। **যথা–**

(ক) ফরজ সাওম : যেমন রমযান মাসের সাওম

(খ) ওয়াজিব সাওম : যেমন মান্নতের সাওম

(গ) সুন্নত সাওম : যেমন আশুরা, আরাফা দিনের ও আইয়্যামে বিযের সাওম, শাওয়ালের ছয় সাওম।

(ঘ) নফল সাওম : সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাওম।

(ঙ) হারাম সাওম : ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও ঈদুল আযহার পরের তিন দিন সাওম পালন করা হারাম।

সাওম যাদের ওপর ফরজ

রমযান মাসের সাওম পালন করা প্রত্যেক মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও বিবেকবান সুস্থ মানুষের উপর ফরজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর রমযানের সাওম ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্বপুরুষগণের উপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

(সূরা বাকারা, ১৮৩)

রমযান মাসের আমল

১. সাহুর খাওয়া সুন্নত, কমপক্ষে কয়েকটি খেজুর বা এক ঢোক পানি হলেও তা দ্বারা সাহরি গ্রহণ করলে এ সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

২. সাওম অবস্থায় সংযমী হওয়া, যেমন : গিবত, মিথ্যা বলা, চোগলখোরি, হাঙ্গামা, রাগ ও বাড়াবাড়ি না করা সুন্নত। এ কাজগুলো সাওম পালনের বাইরেও করা ঠিক নয় তবে সাওম পালনের সময়ে তার থেকে দূরে থাকার বেশি বেশি চেষ্টা করা অপরিহার্য।

৩. সূর্যাস্তের পর তাড়াতাড়ি ইফতার করা।

৪. ইফতারের দোআ পাঠ করা।

৫. দিনের অধিকাংশ সময় দোআ, দরুদ, আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকা।

৬. বেশি বেশি দান-খয়রাত করা।

৭. রমযানের প্রতি রাতে তারাবির সালাত আদায় করা।

৮. তারাবির সালাতে কুরআন মাজিদ একবার খতম করা বা শ্রবণ করা।

৯. ইতিকাফ করা।

সাহুরের পরিচয় ও মর্যাদা

সাহুর (سَحُوْر) শব্দটি আরবি। অর্থ ভোর রাতের খাবার। ইসলামের পরিভাষায় সাওম পালন করার উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করা হয়, তাকে সাহুর বলে।

বি.দ্র. : শেষ রাতে খাবার গ্রহণকে সুহুর (سُحُوْر) বলে। আর খাবারকে সাহুর (سَحُوْر) বলে।

সাহুর খাওয়া সুন্নত। নবি করিম (ﷺ) নিজে সাহুর খেতেন এবং অন্যদেরকেও সাহুর খাওয়ার তাকিদ করতেন। নবি করিম (ﷺ) বলেন–

"তোমরা সাহুর খাও কেননা এতে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে।"

মুসলমানদের সাওম এবং ইয়াহুদি নাসারাদের উপবাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তারা সাহুর খায় না, আর মুসলিমগণ সাহুর খায়। সুবহে সাদিক হতে সামান্য বাকি আছে এতোটা বিলম্ব করে সাহুর খাওয়া মুস্তাহাব। তবে সন্দেহের সময় পর্যন্ত দেরি করা মাকরুহ। কোনো কোনো মানুষ মনে করে- আযান না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া জায়েয, এটি একটি মারাত্মক ভুল ধারণা।

ইফতারের পরিচয় ও মর্যাদা

ইফতার (إِفْطَار) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ ভঙ্গ করা, ভেঙে ফেলা। শরিয়তের পরিভাষায় সারাদিন সাওম পালন শেষে সূর্যাস্ত যাওয়ার পর পর খেজুর, পানি, দুধ, শরবত ইত্যাদি খাবারের মাধ্যমে সাওম ভঙ্গ করাকে ইফতার বলা হয়।

ইফতারের শুরুতে পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার জন্য সাওম পালন করেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করছি।

ইফতার শেষ করে বলবে-

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابتَلَّتِ العُروقُ، وثَبَتَ الأجرُ إن شاءَاللّٰهُ

অর্থ : তৃষ্ণা চলে গেছে, শিরা-উপশিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ চাহেতো প্রতিদান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (সুনানু আবি দাউদ, ২৩৫৭)

ইফতার করা সুন্নত। খেজুর বা খুরমা দ্বারা ইফতার করা সুন্নত। সূর্যাস্তের পরে দেরি না করে ইফতার করা মুস্তাহাব। হাদিসে কুদসিতে আছে: আল্লাহ তাআলা বলেন- আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ বান্দাগণ যারা বিলম্ব না করে ইফতার করে।

অকারণে ইফতারে দেরি করা মাকরুহ। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে সূর্যাস্ত বোঝতে অসুবিধা হলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু সময় বিলম্ব করতে হবে।

সাওম পালনকারীকে ইফতার করানো একটি বড় সাওয়াবের কাজ। রাসুলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোনো সাওম পালনকারীকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তির জন্য তা মাগফিরাত ও দোযখের আগুন থেকে মুক্তি লাভের কারণ হবে এবং সে উক্ত সাওম পালনকারীর সমান সওয়াব লাভ করবে। এতে সাওম পালনকারীর সওয়াবে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না।

সালাতুত তারাবিহ

তারাবিহ (تَرَاوِيْح) শব্দটি আরবি। এটি تَرْوِيْحَة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ বিশ্রাম করা, আরাম করা, বসা। শরিয়তের পরিভাষায় মাহে রমযানে ইশার সালাতের পর অতিরিক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকাত সুন্নত সালাতকে 'সালাতুত তারাবিহ' বলা হয়। এ সালাতকে তারাবিহ নাম রাখা হয়েছে এ জন্যে যে, এতে প্রতি চার রাকাত অন্তর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়। তারাবিহ সালাত মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

অর্থ : যে ব্যক্তি মাহে রমযানে রাতে ইমানসহ সাওয়াবের আশায় কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে তারাবিহ পড়বে, তার অতীতের সমুদয় গুনাহ (সগিরা) মাফ হয়ে যাবে। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

তারাবিহ সালাত আদায় করা নারী-পুরুষ সকলের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) রাতে সালাত আদায় করছিলেন; সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন। এভাবে তিনদিন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর অনুসরণে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে প্রিয়নবি (ﷺ) এ সালাত আদায় করলেন না। কারণ হিসেবে উল্লেখ করলেন–

إِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

অর্থ : এই তারাবিহ সালাত তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি (এ জন্য পড়িনি)।

তারাবিহ সালাতকে প্রিয়নবি (ﷺ) নিজেই সুন্নত ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَ سَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَه، فَمَنْ صَامَه وَ قَامَه إِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِه كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّه.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা রমযান মাসের সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন, আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নতরূপে চালু করেছি রমযানের রাতে আল্লাহর ইবাদাতে দাঁড়ানো। কাজেই যে ব্যক্তি এ মাসে সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে এবং আল্লাহর সামনে কিয়াম (তারাবিহ) করবে ইমান ও আত্মোপলব্ধির সাথে, সে তার গুনাহ হতে এমন ভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে ঐ দিনের মতো যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলো। (মুসনাদে আহমদ, সুনানু নাসায়ি)

তারাবিহ সালাতের রাকাত সংখ্যা

তারাবিহ সালাত দু'রাকাত করে মোট বিশ রাকাত আদায় করা উত্তম।

ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তারাবিহ ২০ রাকাত জামাতের সাথে আদায় শুরু হয়েছে। আজ পর্যন্ত মক্কা মুকাররমায় ও মদিনা মুনাওয়ারায় একই নিয়মে ২০ রাকাত তারাবিহ হয়ে আসছে।

সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন–

كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ شَهْرَ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةٍ.

অর্থ : উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই তাঁরা সবাই রমযান মাসে প্রতি রাতে ২০ রাকাত করে তারাবিহ সালাত আদায় করতেন।

তবে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ.

অর্থ : রাসুলুল্লাহ (ﷺ) রাতে আট রাকাত সালাত আদায় করতেন।

এ আট রাকাত ছিলো রাতের নফল বা তাহাজ্জুদ। যা তিনি রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও আদায় করতেন। সর্বপ্রথম যখন উবাই ইবনে কাব (রাঃ)-এর মাধ্যমে মসজিদে নববিতে তারাবিহ জামাতের সাথে আদায় শুরু হয়, তখন ২০ রাকাত আদায় করা হয়। তবে ২০ রাকাত আদায় করতেই হবে- এমনটি নয়। কেউ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে আট রাকাত তারাবি পড়তে চাইলে, পড়তে পারে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. اَلصَّوْمُ এর আভিধানিক অর্থ কী?

ক. বিরত থাকা
খ. রোযা রাখা
গ. পরিশুদ্ধ হওয়া
ঘ. জ্বালিয়ে দেওয়া

২. নিচের কোনটি সুন্নত সাওম?

ক. আশুরার
খ. আরাফার
গ. শবে বরাতের
ঘ. শুক্রবারের

৩. إفطار শব্দের অর্থ কী?

ক. ভক্ষণ করা
খ. ভঙ্গ করা
গ. সন্ধ্যা হওয়া
ঘ. ফিৎরা দেওয়া

৪. সাওম ফরজ হওয়ার হেকমত হচ্ছে, এতে -

i. শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা পায়
ii. অপরাধ বর্জনের প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়
iii. আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

৫. তারাবিহ শব্দটির অর্থ কী?

ক. বিশ্রাম করা
খ. সালাত পড়া
গ. দোআ করা
ঘ. ঘুম যাওয়া

৬. تَرَاوِيْح শব্দের একবচন কী?

ক. تَرْوِيْحَة খ. تَرْبِيْح

গ. تَرَبح ঘ. تَرَبَاح

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। সাওমের পরিচয় দাও। সাওম কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা দাও।

২। ইফতার করা কী? সালাতুত তারাবিহ বলতে কী বোঝায়? বর্ণনা করো।

৩। রমজানের সাওম কার উপর ফরজ? রমজানের আমলগুলো কী কী? বর্ণনা করো।

দ্বিতীয় পাঠ
নফল সাওম

আইয়ামে বিযের সাওম

আইয়ামে বিয (اَيَّـامُ الْبِـيْضِ) এর অর্থ শুভ্র দিবসসমূহ। প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের এ তিন দিনকে একত্রে আইয়্যামে বিয বলা হয়। এ তিনদিন সাওম পালন করা মুস্তাহাব। হজরত কাতাদা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَّصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلاَثَ عَشَرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ وَ خَمْسَ عَشَرَةَ قَالَتْ وَ قَالَ هُنَّ كَهَيْأَةِ الدَّهْرِ.

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখের বিযের সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন এ তিনটি সাওম পালনে পুরো বছর নফল সাওম পালনের সওয়াব হয়।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হজরত আবু যর গিফারী (رضي الله عنه)-কে বলেন, হে আবু যর! যখন তুমি কোনো মাসে তিনদিন সাওম পালন করবে, তখন ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখ সাওম পালন করবে।

(জামে তিরমিযি ও সুনানু নাসায়ি)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাওম

সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা মুস্তাহাব। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। হজরত উসামা (رضي الله عنه) বলেন–

إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ اَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنِيْنِ و يَوْمَ الْخَمِيْسِ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। তাঁকে এ দুই দিবসের সাওম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে ইরশাদ করেন : বান্দার আমল সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। (আবু দাউদ, ৩৩১)

তিরমিযি শরিফের বর্ণনায় রয়েছে: তিনি বলেন, আমি আশা করি আমার সাওম পালন অবস্থায় আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ হোক।

হজরত আবু কাতাদা (ﷺ) বলেন, হজরত নবি করিম (ﷺ)-কে সোমবারের সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন–

فِيْهِ وُلِدْتُّ وَ فِيْه أُنْزِلَ.

অর্থ : ঐদিন আমার জন্ম হয়েছে এবং ঐ দিনই আমার উপর ওহি নাযিল হয়েছে। (মুসলিম)
এ হাদিসে প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবি (ﷺ) সাওম পালনের মাধ্যমে তার মিলাদ ও কুরআন অবতীর্ণের স্মৃতিকে মর্যাদাবান করেছেন।

সাওমের কাফফারা

শুধু রমযানের সাওম ভঙ্গ হলে কাযা হবে, আর ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করলে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে। রমযান ছাড়া অন্য সাওম ভঙ্গ হলে তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না, তা ভুলক্রমে ভঙ্গ হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করা হোক। রমযানের কাযা সাওম পালন করার সময় তা ভঙ্গ হলে অথবা ভঙ্গ করলে তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না। শুধু রমযানের সাওম ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

যে সমস্ত কারণে সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়

যে সমস্ত কারণে সাওম ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। সাওম অবস্থায় সুস্থ শরীরে কোনো প্রকার খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করলে অথবা ওষুধ সেবন করলে সাওম ভঙ্গ হবে এবং এ প্রকার সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

২। ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম ভঙ্গ করলে সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

৩। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পেটে প্রবেশ করালে।

৪। সাওম পালন অবস্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ করলে।

সাওমের কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি

সাওম পালন করা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত সাওম ভঙ্গ করলে সাওম পালনকারীর উপর অতিরিক্ত জরিমানা স্বরূপ যে কার্য সম্পাদন করতে হয় তাকে কাফফারা বলে। সাওমের কাফফারা হচ্ছেঃ একাধারে বিরতিহীনভাবে চান্দ্র দুই মাস সাওম পালন করা। মাঝখানে বাদ পড়লে আবার নতুন করে দুই মাস সাওম পালন করতে হবে। পূর্বেরগুলো এর সাথে যোগ করা হবে না।

কারও পক্ষে এরূপ সাওম পালন করা শরিয়ত সমর্থিত ওজরের কারণে সম্ভব না হলে কাফফারার সাওমের পরিবর্তে ৬০জন মিসকিনকে এক দিনে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে বা সে পরিমাণ খাদ্যের মূল্য গরিব মিসকিনকে দিতে হবে।
এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا-

অর্থ : সে যেন ধারাবাহিক পূর্ণ দুই মাস সাওম পালন করে অথবা ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ায়। (সূরা বাকারা ও মুজাদালা)

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান দৃষ্টিতে সাওমের উপকারিতা

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান দৃষ্টিতে সাওমের উপকারিতা অনেক। একমাস সাওম পালনের ফলে শরীরের অনেক অঙ্গ প্রতঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। প্রতিদিন প্রায় পনের ঘণ্টা সময় এই বিশ্রামে লিভার, প্লীহা, কিডনি, মূত্রথলিসহ দেহের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ দীর্ঘ সময়ব্যাপী বেশ বিশ্রাম পায়।

সারাবছর দেহের অভ্যন্তরে যে বিষ সৃষ্টি হয় তা এক মাসের সিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সাওম পালনে আলসার প্রদাহ উপশম হয়। ফুসফুসে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি হলে সাওম তা দূর করে দেয়। সাওম আলস্য ও গোঁড়ামি দূর করে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা কী?

ক. সুন্নত　　খ. মুস্তাহাব

গ. মাকরুহ　　ঘ. মুবাহ

২. ইচ্ছাকৃত একটি ফরজ সাওম ভঙ্গ করলে কয়টি সাওম রাখতে হয়?

ক. ৩০　　খ. ৪০

গ. ৫০　　ঘ. ৬০

৩. সাওমের কাযা ও কাফফারা আদায় করতে হয়, যখন কেহ-

i. ইচ্ছাকৃত সাওম ভঙ্গ করে

ii. সাওম অবস্থায় ভুল করে কিছু খায়

iii. অসুস্থ অবস্থায় ঔষধ সেবন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

৪. আইয়ামে বিযের রোজা রাখার হুকুম কী?

ক. ফরজ　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত　　ঘ. মুস্তাহাব

৫. আইয়ামে বিযের রোজা কতটি?

ক. ২টি　　খ. ৩টি

গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

৬. সপ্তাহে কোন দুই দিন বান্দাহর আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়?

ক. সোম ও বৃহস্পতি　　খ. বৃহস্পতি ও শুক্রবার

গ. সোম ও শুক্রবার　　ঘ. রবি ও সোমবার

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। আইয়ামে বিয বলতে কী বুঝায়? আইয়ামে বিযের রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত লেখ।

২। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাওমের উপকারিতা বর্ণনা করো।

৩। কখন সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়? আলোচনা করো।

৪। প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা বর্ণনা করো।

সপ্তম অধ্যায়

যাকাত

اَلزَّكَاةُ

প্রথম পাঠ

যাকাতের পরিচয় ও ফযিলত

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (اَلزَّكَاةُ) শব্দটি نَصَرَ باب-এর فَعَال ওজনে মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ اَلنُّمُوُّ তথা ক্রমবৃদ্ধি, اَلطَّهَارَةُ তথা পবিত্রতা লাভ করা, আধিক্য, পরিশুদ্ধি ও পরিপূর্ণতা লাভ করা ইত্যাদি। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক বছরান্তে তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (শতকরা ২.৫০ হারে) যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে প্রদান করাকে যাকাত বলে।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত বলতে বোঝায় –

اَلْجُزْءُ الْمُقَدَّرُ مِنَ الْمَالِ الَّذِيْ فَرَضَهُ اللهُ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ.

অর্থ : সম্পদের ঐ সুনির্ধারিত অংশ যা হকদারকে দেওয়া আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন।

যাকাতকে ফরয হিসেবে বিধান করার উদ্দেশ্য

১. কৃপণতা, সংকীর্ণতা, লোভ থেকে মানবজাতির আত্মাকে পূতপবিত্র করা।

২. দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতা, অসহায়দের অভাব পূরণ ও বঞ্চিতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ।

৩. সাধারণ জনগণের মধ্যে আর্থিক সমতা বিধান ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. ধনীদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া রোধ করা, সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

যাকাতের শরয়ি মর্যাদা

যাকাত ইসলামি জীবন বিধানের অন্যতম মৌল স্তম্ভ ও অবশ্য পালনীয় ফরয ইবাদত। তাই আল্লাহর দেওয়া সম্পদ হতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ তাঁরই নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাই একজন মুসলমানের কর্তব্য। ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দূর করে সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে সবাইকে গ্রথিত করার যে ব্যবস্থা তারই নাম যাকাত।

কুরআনের আলোকে যাকাত

কুরআন মজিদে যাকাত শব্দটি সরাসরি ৩২বার এসেছে। اَلزَّكَاةُ মাসদার থেকে বিভিন্নরূপে সালাতের সাথে এসেছে ২৬ বার। যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَ أَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

অর্থ : সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর, আর রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

(সূরা বাকারা, ৪৩)

হাদিসের আলোকে যাকাত

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হল যাকাত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّاللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حَجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : ইসলামের বুনিয়াদি স্তম্ভ পাঁচটি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল এ সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমজান মাসে সাওম পালন করা এবং আল্লাহর ঘরের হজ করা। (সহিহ বুখারি-৮, সহিহ মুসলিম-১৬)

মুআয ইবনে জাবাল (رضي الله عنه)-কে ইয়ামেনের গভর্নর নিযুক্ত করে রাসুলে করিম (ﷺ) ঘোষণা দেন–

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

অর্থ : তাদের জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তাআলা সদকা (যাকাত) ফরয করে দিয়েছেন; যা তাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করে গরিব বা ফকিরদের মাঝে বণ্টন করবে।

(সহিহ বুখারি-১৩৯৫)

যাকাতের প্রকার

যাকাত প্রধানত চার প্রকার। যথা–

১। ফসলের যাকাত (যাকে পরিভাষায় ওশর বলা হয়) ;

২। গবাদি পশুর যাকাত ;

৩। সোনা, রুপা, নগদ টাকা ও ব্যবসা পণ্যের যাকাত;

৪। সাওমের যাকাত (যাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়) ।

দ্বিতীয় পাঠ
যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহকে আরবিতে مَصَارِفُ الزَّكَاةِ বলে। যাকাত সকলকে দেওয়া যায় না। পবিত্র কুরআন মাজিদে কেবল আট শ্রেণির লোককে যাকাত দেওয়ার নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِيْنَ وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

অর্থ : এ সদকা (যাকাত) তো ফকির-মিসকিনদের জন্য, তাদের জন্য যারা সদকার কাজের জন্য নিয়োজিত, তাদের জন্য যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফরয বিধান এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত তওবাহ, ৬০)।

কুরআনের এ আয়াতের নির্দেশানুযায়ী যাকাত আট শ্রেণির মানুষ গ্রহণ করতে পারবে। তা হলো–

১। **ফকির** (اَلْفُقَرَاء) : যাদের সামান্য সম্পদ আছে তবে যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই।

২। **মিসকিন** (اَلْمَسَاكِيْن) : যারা নিঃস্ব, নিজের অন্ন সংগ্রহ করতে পারে না। অভাবের তাড়নায় অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যারা কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য এবং মানবেতর জীবন যাপন করে, তারাও মিসকিনদের মধ্যে গণ্য।

৩। **যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী** (اَلْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا) : ইসলামি রাষ্ট্রে যাকাত সংগ্রহ, বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করার জন্য যাদের নিয়োগ দেওয়া হবে তাদের বেতন-ভাতা যাকাত তহবিল থেকে দেওয়া যাবে।

৪। **মুয়াল্লাফাতুল কুলূব** (مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ) : অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ব্যয় করা।

৫। রিকাব বা দাস মুক্তকরণ (فِى الرِّقَابِ) : ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দানের বিনিময়ে মুক্তি লাভের সুযোগ সৃষ্টি করলে, যাকাত ফাণ্ড থেকে সে অর্থ দিয়ে দাস মুক্ত করা যাবে। অথবা যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে তাকে মুক্ত করা যাবে।

৬। গারিমিন বা ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করা (اَلْغَارِمُوْنَ) : কেউ বৈধ কোনো কাজে ঋণ করে সে ঋণ শোধ করতে সক্ষম না হলে যাকাতের অর্থ দিয়ে তাকে ঋণমুক্ত করা যাবে। অপ্রত্যাশিত কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো কারণে ব্যবসা নষ্ট হয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে।

৭। ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় (فِىْ سَبِيْلِ اللهِ) : আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর পথে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৮। ইবনুস সাবিল বা নিঃস্ব পথিক (اِبْنُ السَّبِيْلِ) : মুসাফির বা প্রবাসি লোক স্বদেশে সম্পদ থাকলেও সফরে যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে।

তৃতীয় পাঠ

যার উপর যাকাত ফরজ

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী যাকাত ফরয হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যাদের উপর যাকাত ফরজ তাদের জন্য শর্ত হলো–

১। মুসলমান হওয়া

২। সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া

৩। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া

৪। ঋণী না হওয়া

৫। পূর্ণ স্বাধীন হওয়া

৬। সম্পদ চন্দ্র মাসের হিসেবে এক বছর কাল স্থায়ী হওয়া

৭। নিসাব পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া : প্রকৃত প্রয়োজন বলতে বোঝায় এমন সব জিনিস যার উপর মানুষের জীবন যাপন ও ইজ্জত আবরু নির্ভরশীল। যেমন : খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বসবাসের ঘর-বাড়ি, পেশাজীবী লোকের পেশা সংক্রান্ত যন্ত্র-পাতি, যানবাহনের পশু, সাইকেল, মোটর ইত্যাদি এ সকল গৃহস্থলি সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর যাকাত ফরজ হবে না।

৮। সম্পদ বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ থাকা।

চতুর্থ পাঠ

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

নির্দিষ্ট সম্পদের মালিক হয়েও যদি কেউ যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পূর্ণ সম্পদ শুধুমাত্র অপবিত্রই হয় না বরং এ জন্য ভয়াবহ পরিণামও অবধারিত রয়েছে। যাকাত আদায় না করার কঠিন ও কঠোর পরিণতির কথা কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

অর্থ : আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে অথচ তা আল্লাহর পথে (যাকাত) ব্যয় করে না, তাদেরকে শুনিয়ে দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হবে তাদের ললাটে, পাঁজরে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে। বলা হবে এই সম্পদই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। (সূরা তওবা, ৩৪-৩৫)।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন–

مَنْ اَتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّيْ زَكَاتَه مُثِّلَ لَه مَالُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعُ لَه زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِيْ شَدَقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَامَالُكَ وَ اَنَا كَنْزُكَ .

অর্থ : আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন সে যদি তার যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদ কিয়ামতের দিন মারাত্মক বিষধর সর্পের আকার ধারণ করবে, যার কপালের উপর দুটি কালো চিহ্ন কিংবা দুটি দাঁত বা দু'টি শৃঙ্গ থাকবে। কিয়ামতের দিন এ সর্পকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সাপটি তার মুখের দুই পাশে কামড়ে ধরে বলবে আমিই তোমার ধন-সম্পদ। আমিই তোমার সঞ্চিত বিত্ত-সম্পত্তি। (সহিহ বুখারি ও নাসায়ি)।

উল্লিখিত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে নববির বাণীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত আদায় না করার শাস্তি ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাছাড়া এমন কঠিন শাস্তি অপেক্ষমান যার থেকে পালাবার কোনোই পথ নেই।

পঞ্চম পাঠ

যেসব সম্পদের যাকাত ফরজ

যেসব সম্পদে যাকাত আদায় করা ফরজ হয়, সেগুলো হলো–

১। স্বর্ণ ও রৌপ্য: ৭.৫ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৫৩ গ্রাম রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ সম্পদ ১ বৎসর পর্যন্ত যদি মালিকানায় থাকে।

২। উট, গরু ও ছাগল : উট কমপক্ষে ৫টি হলে, গরু ৩০টি হলে, ছাগল বা ভেড়া ৪০টি হলে যাকাত ফরয হয়

৩। ফসল ও ফলের যাকাত : উৎপাদিত ফসলের যাকাত, যেমন : গম, যব, ছোলা, চাল, ডাল, খেজুর, আলু, যয়তুন ইত্যাদি কম হোক কিংবা বেশি হোক তাতে যাকাত দিতে হবে। সেচের মাধ্যমে হলে ২০ ভাগের এক ভাগ, বৃষ্টির, নদীর বা স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত পানি থেকে উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।

৪। ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ সম্পদ : ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লগ্নিকৃত অর্থ-সম্পদের ওপর যাকাত ফরয।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. اَلزَّكَاةُ শব্দের অর্থ কী?

ক. বৃদ্ধি পাওয়া খ. এগিয়ে যাওয়া
গ. অর্জিত হওয়া ঘ. গ্রহণ করা

২. اَلْغَارِمِيْنَ বলে যাকাতের কোন খাতকে বোঝানো হয়েছে?

ক. দরিদ্র খ. অসহায়
গ. ঋণগ্রস্ত ঘ. মুসাফির

৩. গরুর যাকাতের নিসাব কয়টি?

ক. ২০ খ. ৩০
গ. ৪০ ঘ. ৬০

৪. যাকাত অনাদায়ীর সম্পদ কিয়ামতে তাকে -

i. সাপ হয়ে কামড়াবে
ii. জাহান্নামে নিয়ে যাবে
iii. আগুনের দাগ দিবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. শরিয়তের দৃষ্টিতে যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা কী?

ক. জায়েজ খ. জায়েজ নাই
গ. মুবাহ ঘ. মাকরূহ

৬. যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি–

ক. ৮টি খ. ৯টি

গ. ১০টি ঘ. ১১টি

৭. যাকাত ব্যয়ের খাত কয়টি–

ক. ৮টি খ. ৯টি

গ. ১০টি ঘ. ১১টি

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. اَلزَّكَاةُ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা লেখ। যাকাত ফরযের উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা করো।

২. مَصَارِفُ الزَّكَاةِ কাকে বলে এবং কয়টি ও কী কী বর্ণনা করো।

৩. যাকাতের শররি মর্যাদা ও যাকাত আদায় না করার পরিণাম সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে বর্ণনা করো।

অষ্টম অধ্যায়

পানাহার

اَلْأَطْعِمَةُ وَالْأَشْرِبَةُ

اَلْأَطْعِمَةُ وَالْأَشْرِبَةُ-এর পরিচয়

আতইমা (اَلْأَطْعِمَة) শব্দটি طَعَام শব্দের বহুবচন। এর অর্থ খাদ্য সামগ্রী। আর আরশিবা (اَلْأَشْرِبَة) শব্দটি شَرَاب শব্দের বহুবচন। এর অর্থ পানীয় বস্তুসমূহ। ইসলামে মেহমানদারি সুন্নত। প্রত্যেককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মেহমানদারি করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه.

অর্থ : যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে।

(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

এখানে 'মেহমানের সম্মান' বলতে তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করা, উত্তম খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করাকে বোঝানো হয়েছে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে কেউ প্রশ্ন করলো : ইমান কী? তিনি বললেন : অপরকে আহার করানো ও সালামের চর্চা করা।

হজরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, যে ঘরে মেহমান আসে না, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

খাওয়ার অনুষ্ঠানে ফকির ও গরিবদেরকে বাদ দিয়ে যেনো শুধু ধনীদের দাওয়াত দেওয়া না হয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

شَرُّ الطَّعَامِ اَلْوَلِيْمَةُ يُدْعٰى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ دُوْنَ الْفُقَرَاءِ.

অর্থ : সেই বিয়ের খাওয়ার অনুষ্ঠান সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাতে গরিবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

খানাপিনার অপচয় করা যাবে না। অপচয় করা কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لاَ تُسْرِفُوْا.

অর্থ : তোমরা খাও, পান কর, অপচয় করো না। (সূরা আরাফ, ৩১)

কতগুলো বৈধ খাদ্য ও পানীয়র নাম

যে সকল খাদ্য বা পানীয় কুরআন সুন্নাহ হারাম বা মাকরুহ ঘোষণা দিয়েছে সেগুলো ছাড়া সবই হালাল। যেমন : রুটি, ভাত, গোশত, মাছ, ডিম, গম, যব, ডাল, সবজি, চিনি, গুড়, খৈ, মুড়ি, ফল-মূল, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, হলুদ-মরিচ, লবণ ইত্যাদি।

পানীয়ের মধ্যে পানি, দুধ, দই, মধু ইত্যাদি।

হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধ বিষয়ে আল কুরআনের মূলনীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। ইরশাদ হয়েছে–

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

অর্থ : তিনি (রাসুলুল্লাহ ﷺ) তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ। (সূরা আরাফ, ১৫৭)।

কতগুলো হারাম খাদ্য ও পানীয়

যে সকল খাদ্য ও পানীয় কুরআন ও সুন্নায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোই হারাম খাদ্য ও পানীয়। হারাম খাদ্য অনেক, যেমন : শুকরের মাংস, রক্ত, মৃত জন্তু, আল্লাহর নাম না নিয়ে অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা পশু ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন –

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالاَزْلاَمِ ذَالِكُمْ فِسْقٌ .

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাইকৃত পশু, শ্বাস রোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু, এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছো তা বৈধ। আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা, জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা এ সবই পাপ কাজ।

(সূরা মায়িদাহ, ৩)

পানীয়র মধ্যে অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হলে তা হারাম হয়ে যায়। বিষ ও বিষ জাতীয় সকল বস্তুই হারাম। বিষ নয় কিন্তু ক্ষতিকর এমন বস্তুও হারাম। যেমন : কাদা, মাটি, পাথর, কয়লা ইত্যাদি।

মাদক দ্রব্য যেমন : গাঁজা, আফিম, কোকেন, ভাং, হিরোইন, ভদকা, ফেন্সিডিল ও পেথিড্রিন ইত্যাদি পান করা ও ব্যবহার করা হারাম।

এ সকল খাদ্য ও পানীয় ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি হয়, যেমন : যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস, ক্যান্সার, হৃদরোগ, জন্ডিস, হেপাটাইটিস, সিরোসিস, কিডনি রোগ, আলসার, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি।

ইসলাম মানুষের ক্ষতি হতে পারে এমন সব বস্তু খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন : মদ্যপান সকল অশ্লীলতা ও কবিরা গুনাহের উৎস।

(কানযুল উম্মাল, ৫/৩৪৯)।

ধূমপান চরম ক্ষতিকর এবং বদ অভ্যাস, এটি স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। অর্থের অপচয় ঘটায়। এ কারণে এটিও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (ফিকহুস সুন্নাহ, ৩/২৪৬)।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. ইসলামে মেহমানদারির হুকুম কী?

ক. ওয়াজিব　　খ. সুন্নত

গ. মুস্তাহাব　　ঘ. মুবাহ

২. খানা-পিনার অপচয় করা কোন ধরনের গুনাহ?

ক. কবিরা　　খ. সগিরা

গ. শিরকি　　ঘ. নেফাকি

৩. ধূমপান –

i. একটি বদ অভ্যাস

ii. স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে

iii. অর্থ অপচয় করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. ইসলামে কোন ধরনের বস্তু খাওয়া ও পান করার নিষিদ্ধ করেছে?

ক. এক ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট অন্য ব্যক্তির জন্য

খ. যে সকল বস্তু বিধর্মীরা তৈরি করে

গ. যে সকল বস্তু মানুষের জন্য ক্ষতিকর

ঘ. যে সকল বস্তু মানুষের জন্য বিস্বাদ

৫. মদ্যপান কিসের উৎস–

ক. সকল অশ্লীলতা ও কবিরা গুনাহের উৎস

খ. সকল আনন্দ ও উদ্দীপনার উৎস

গ. সকল পাপাচার ও বেহায়াপনার উৎস

ঘ. সকল উৎসব ও প্রেরণার উৎস

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। الْأَطْعِمَةُ শব্দের অর্থ কী? হালাল ও হারাম খাদ্য ও পানীয়র পরিচয় দাও।

২। মেহমানদারি সম্পর্কে রাসুল (ﷺ)-এর একটি হাদীস অনুবাদসহ লেখ।

তৃতীয় ভাগ

আখলাক বা চরিত্র

اَلْأَخْـلَاقُ

প্রথম অধ্যায়

উত্তম চরিত্র

اَلْأَخْـلَاقُ الْـحَسَنَهُ

প্রথম পাঠ

উন্নত চরিত্র অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দু'টি বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, একটি মানবিক অপরটি পাশবিক। মানবিক দিককে উন্নত চরিত্র বা اَلْأَخْـلَاقُ الْـحَسَنَةُ বলে। এর দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। উন্নত চরিত্র অর্জন না করে মানুষ যখন নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করে তখনই তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যায় এবং কখনো কখনো তার চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

অর্থ : তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তারা পথভ্রষ্ট। (সূরা আরাফ, ১৭৯)

তখন তারা হয় মানবকুলের অমানুষ। তাই প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

অর্থ : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট। (মিশকাত, ৪৩১)

তাই দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের জন্য প্রতিটি মানুষের সচ্চরিত্রবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অপমান, ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হবে।

উন্নত চরিত্র অর্জনের পদ্ধতি

উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য নিচের গুণাবলি অর্জন করা প্রয়োজন–

১। ইমানের ক্ষেত্রে ইখলাস বা নিষ্ঠা ;

২। ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক মুক্ত হওয়া ও একাগ্রতা সৃষ্টি ;

৩। ইহসান তথা যথা সময়ে, যথা নিয়মে ও সর্বোত্তমভাবে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলিতে ভূষিত হওয়া ;

৪। তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন;

৫। মন মানসিকতায় ভালো কাজের চেতনা সৃষ্টি করা;

৬। কৃত অন্যায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তওবা করা;

৭। অতীত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আত্মোপলব্ধি সৃষ্টি করা;

৮। চিন্তা গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও সম্পাদন করা;

৯। তাওয়াক্কুল বা প্রচেষ্টার পর সবকিছু আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা;

১০। সবর তথা সর্বাবস্থায় নীতি ও আদর্শে অবিচল থাকা ;

১১। হায়া বা লজ্জাবোধ থাকা;

১২। সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, বিনয় প্রকাশ ইত্যাদি মৌলিক গুণাবলি অর্জন করা ;

১৩। আচরণের ক্ষেত্রে ভদ্রতা, শালিনতা, আদব রক্ষা করা;

১৪। উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো উন্নত চরিত্রের অধিকারী আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্যে থেকে সৎ গুণাবলি অনুশীলন ও চরিত্রসমূহ অভ্যাসে পরিণত করা এবং

১৫। সর্বক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের যিকির ও ফিকিরে থাকা ।

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ ও রাসুল (ﷺ)-এর প্রতি মুহাব্বত

আল্লাহ তাআলা স্রষ্টা, মনিব, রহমান, রহিম, রিযিকদাতা, জান-মাল সবকিছুর একমাত্র মালিক তিনি। এ বিশ্বাস যাদের আছে, আল্লাহর প্রতি তাদের মহব্বত, আল্লাহর রাসুলের প্রতি তাদের ভালবাসা হবে অকৃত্রিম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

অর্থ : যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল। (সূরা বাকারা, ১৬৫)

যে ইবাদতে মুহাব্বত নেই তা প্রাণহীন। প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি ভালবাসা মুমিনের ইমান এবং ইমানের মূল । তিনি নিজেই ইরশাদ করেন–

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কেউ-ই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ ও রাসুল (ﷺ)-কে ভালোবাসা প্রমাণ হলো–

১. তাঁদের হুকুম পালন করা;
২. তাঁদের নিষেধ থেকে ফিরে থাকা;
৩. সবসময় আল্লাহর যিকির ও ফিকিরে থাকা এবং প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা;
৪. আল্লাহর নিদর্শনসমূহ-যথা বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববী ও বায়তুল মুকাদ্দাস প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা;
৫. আল্লাহ ও রসুলের কাছে যারা প্রিয় তাদেরকে ভালবাসা এবং যারা দুশমন তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা।

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহর ওলির পরিচয়

وَلِيّ শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, সাহায্যকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত। নবি ও রাসুলগণের রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ তাআলার বন্ধুতে উন্নীত হয়েছেন তারাই ওলি। ওলির পরিচয় দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

অর্থ : যারা ইমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সু-সংবাদ। (সূরা ইউনুস, ৬৩–৬৪)

ওলির প্রধান দুটি গুণ হলো, ইমান ও তাকওয়া। ওলিগণের মর্যাদা অনেক। তবে কেউ নিজেকে ওলি দাবী করতে পারবে না। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে খাঁটি মুসলিম হওয়ার অব্যাহত সাধনার মাধ্যমেই এ মর্যাদা অর্জিত হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. اَلْأَخْلَاق শব্দের অর্থ কী?

ক. স্বভাব খ. চরিত্র
গ. আচরণ ঘ. সদ্ব্যবহার

২. প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি মুহাব্বত রাখা কী?

ক. ইসলাম খ. ইমান
গ. আমল ঘ. ইহসান

৩. ওলির প্রধান প্রধান গুণ হচ্ছে –

i. তাকওয়া ও আমল
ii. ইমান ও তাকওয়া
iii. ইহসান ও আমল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪. মুমিনের অন্যতম কাজ হলো :

i. আমলের প্রতি মহব্বত রাখা
ii. আল্লাহর প্রতি মহব্বত রাখা
iii. রাসুল (ﷺ)-এর প্রতি মহব্বত রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫. اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ শব্দের অর্থ কী?

ক. উন্নত চরিত্র

খ. সত্যবাদিতা

গ. উত্তম আমল

ঘ. ন্যায়পরায়ণতা

৬. وَلِيّ শব্দের অর্থ কী?

ক. পিতা

খ. মাতা

গ. বন্ধু

ঘ. ভাই

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ কী? মানব জীবনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

২। রাসুল(ﷺ)-এর প্রতি মুহাব্বত সম্পর্কীয় একটি হাদিস অনুবাদসহ লেখ।

চতুর্থ পাঠ
তাকওয়া

তাকওয়া (اَلتَّقْوَى) শব্দটি আরবি। এর অর্থ আল্লাহর ভয়, পরহেযগারি, দ্বীনদারি, সংযমি। শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হলো– حِفْظُ النَّفْسِ عَمَّا يُوْثَمُ

অর্থ : যার দ্বারা গুনাহ হয় এমন কথা, কাজ থেকে নিজ আত্মাকে মুক্ত রাখা। (আল মুফরাদাত)

আল কুরআনে তাকওয়া পরিভাষাটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

১। اَلْخَوْفُ وَالْخَشْيَة বা ভয়ভীতি, ২। اَلْعِبَادَات বা বন্দেগি, ৩। تَرْكُ الْمَعْصِيَّةِ বা পাপ ছেড়ে দেওয়া, ৪। اَلتَّوْحِيْد বা একত্ববাদ ও ৫। اَلْإِخْلَاص বা কথা ও কাজে নিষ্ঠা

তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থ : ওহে যারা ইমান এনেছ ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না। (সূরা আল ইমরান, ১০২)

মুত্তাকিগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট সম্মানী। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ : তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক পরহেযগার। (সূরা হুজুরাত, ১৩)

বিদায় হজের ভাষণে প্রিয় রাসুল (ﷺ) বলেন–

اِتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

অর্থ : তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর, রমযানে সাওম পালন কর; মালের যাকাত আদায় কর, নেতার আনুগত্য কর, তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ কর।

(জামে তিরমিজি)

আলি ইবনে আবু তালিব (رضي الله عنه) বলেন–

التَّقْوَى هُوَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ، وَالرِّضَا بِالْقَلِيْلِ وَالاِسْتِعْدَادُ لِيومِ الرَّحِيل.

অর্থ : তাকওয়া হলো মহান আল্লাহকে ভয় করা, অবতীর্ণ কিতাব অনুযায়ী আমল করা, স্বল্পে তুষ্ট থাকা এবং বিদায় দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। (দালিলুস সায়েলিন, ১১৪)

তাই আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে স্থান দিয়ে পরকালে নিজের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহিতার কথা চিন্তা করে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবিব সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের সাথে কর্মসম্পাদন করাই হবে একজন মুত্তাকির কাজ। আর মুত্তাকির পুরস্কার হল জান্নাত।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ : মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রয়েছে ।

পঞ্চম পাঠ

ত্যাগ স্বীকার

ত্যাগ (اَلإِيْثَار) বলতে অপর মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণের জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার করা এবং তাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেওয়াকে বোঝায়।

রাসুল (ﷺ)-এর সাহাবিগণের জীবন এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাঁদের ত্যাগের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন–

وِ يُؤْثِرُوْنَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

অর্থ : তারা নিজের উপর অন্যান্যদের (প্রয়োজন) কে অগ্রাধিকার দেয়। যদিও তারা রয়েছে অনটনের মধ্যে। (সূরা হাশর, ০৯)।

রাসুল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবিগণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ষষ্ঠ পাঠ

ক্ষমা করা

ক্ষমা (اَلْعَفْو) শব্দের অর্থ মাফ করা, প্রতিশোধ না নেওয়া। ইসলামের পরিভাষায় প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীকে মাফ করে দেওয়ার নামই ক্ষমা।

আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা মহা ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

ক্ষমা আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ তাআলা মানুষকে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের সকল সুখ শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ মূর্খতাবশত শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর কথা ভুলে যায়। তার হুকুম অমান্য করে, তার সাথে শিরক করে, তার নিআমত অস্বীকার করে। এরপর যখন তারা নিজেদের ভুল বোঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন।

সপ্তম পাঠ

বিনয় প্রকাশ

বিনয় (اَلتَّوَاضُع) শব্দের অর্থ হলো, অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট জ্ঞান করা এবং অন্যদেরকে বড় মনে করা। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে হলে বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে কুরআনে মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

অর্থ : রাহমানের (আল্লাহর) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।

(সূরা ফোরকান, ৬৩)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلا رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থ : কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তবে মহান আল্লাহ তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন। (সহিহ মুসলিম)

বিনয় মুমিনের জিন্দেগির ভূষণ। পক্ষান্তরে অহংকার হচ্ছে পাপীষ্ঠ হওয়ার নিদর্শন।

অষ্টম পাঠ

শিক্ষকের প্রতি আদব

শিক্ষক মানুষের অন্ধকার জীবনে আলোর দিশা দেন। মাতা-পিতা জন্মদাতা হিসেবে সম্মানের পাত্র। কিন্তু, মাতা-পিতা সকলকে মানুষ বানাতে পারেন না। শিক্ষকই মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। আল্লাহ তাআলা হজরত আদম (ﷺ)-কে জ্ঞান দান করে ফেরেশতাদেরকে সে জ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা অপারগতা প্রকাশ করায় আদম (ﷺ) তাদেরকে জ্ঞানের কথাগুলো শেখালেন। আর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন, আদম (ﷺ)-কে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন হিসেবে সেজদা করার। তাই শিক্ষকের প্রতি সম্মান দেখানো নৈতিক দায়িত্ব।

সম্মান প্রদর্শনের কয়েকটি পদ্ধতি হলো–

১. শিক্ষককে পিতৃতুল্য মনে করা;

২. তাঁর আদেশ-নিষেধকে গুরুত্বের সাথে পালন করা;

৩. যথাসাধ্য শিক্ষকের খেদমত করা;

৪. এমন কোনো কাজ না করা বা কথা না বলা যাতে তিনি মনক্ষুণ্ন হন;

৫. শিক্ষকের সামনে কথা বলার সময় বিনয়ের সাথে বক্তব্য উপস্থাপন করা;

৬. শিক্ষক সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আদবের সাথে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা;

৭. শিক্ষক অসুস্থ হলে তাঁর সেবা করা, অভাবী হলে তাঁকে সাধ্যমত সহায়তা করা;

৮. সবসময় শিক্ষকের জন্য দোআ করা;

তাই যার কাছে একটি হরফও শিখবে সেই সম্মানিত শিক্ষক। তার তা'যিম করা, সেবা করা ছাত্রের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নবম পাঠ

অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতি

অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি গ্রহণ মহান আল্লাহর নির্দেশ ও আদব প্রদর্শনের অন্যতম দিক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! অন্যের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না। প্রবেশ করার সময় ঘরের বাসিন্দাদের সালাম দেবে। এ আদব প্রদর্শন তোমাদের জন্য উত্তম আচরণ। বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক। (সূরা আন নূর, ২৭)

প্রিয় রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلإِسْتِيْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَ إِلاّ فَارْجِعْ

অর্থ : অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে প্রথমবার সাড়া না পেলে দ্বিতীয়বার, তাতেও সাড়া না পেলে তৃতীয়বার অনুমতি চাইবে। তৃতীয়বারও সাড়া না পেলে ফিরে আসবে।

অনুমতি চাওয়ার সময় ভেতর থেকে যদি বলে 'কে'? জবাবে নিজের নাম ও পরিচয় বলতে হবে। কলিং বেল থাকলে প্রথমে আস্তে কল করবে। তাতে সাড়া না পেলে আরেকটু জোরে বেল চাপ দিতে হবে, তাতেও সাড়া না পেলে জোরে চাপ দিতে হবে। তাতেও সাড়া না পেলে ফিরে আসতে হবে। বাড়িওয়ালা রাজি না থাকলে জোর করে বিরক্ত করে তার ঘরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

দশম পাঠ

সৎসঙ্গ লাভ

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা থাকতে পারে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঙ্গী প্রয়োজন। সঙ্গী কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থ : তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও।(সূরা তওবা, ১১৯)

কথা, কাজে, আচরণে যিনি সততা ও সত্যবাদিতার আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তার সাথি হলে নিজেও সৎ হবে। প্রিয় রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

الرَّجُلُ عَلٰى دِينِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

অর্থ : ব্যক্তি তার বন্ধুর স্বভাবে প্রভাবিত হয়, তাই কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তা নিয়ে ভাবা উচিত। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

হজরত ওমর (رضي الله عنه) বলেন–

وَحْدَةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوءِ

অর্থ : খারাপ সঙ্গী গ্রহণের চেয়ে একা থাকা অনেক ভালো। (দালিলুস সায়েলীন, ১৫৫)

মাওলানা রুমী (رحمه الله) বলেন–

صحبت صالح ترا صالح کند + صحبت طالح ترا طالح کند

অর্থ : নেককার লোকের সঙ্গী হলে তোমাকে নেককার বানাবে। অসৎ লোকের সঙ্গী হলে তোমাকে অসৎ বানিয়ে ছাড়বে। বাংলায় বলা হয় - 'সৎ সঙ্গে সর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'

তাই মিথ্যাবাদী, অসৎ, খেয়ানতকারী, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হুকুম অমান্যকারীর সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। হাক্কানী আলেম ও ওলি-আওলিয়ার সাথি হতে হবে। তাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত।

একাদশ পাঠ

এতিমের প্রতি দয়া

ছোটকালে যাদের পিতা মারা যায় তাদেরকে এতিম বলে। এতিমদের প্রতি সহায়তা দান জান্নাতি মানুষের স্বভাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

অর্থ : তারা দুনিয়ার জীবনে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি নিজেদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিন, এতিম ও বন্দিদের আহার প্রদান করে। (সূরা আদ্ দাহর, ৮)

রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন–

أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ

অর্থ : আমি এবং এতিমের জিম্মাদার ব্যক্তি একত্রে জান্নাতে থাকব। (সহিহ বুখারি)

এতিমের সম্পদ কুক্ষিগত করাকে জাহান্নামের আগুন খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন মহান আল্লাহ। তাই এতিমের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা, তাদের দায়িত্ব নেওয়া একজন মুসলিমের অন্যতম কর্তব্য।

ত্রয়োদশ পাঠ

অসচ্চরিত্র পরিহার

মানুষের মধ্যে এমন কিছু স্বভাব রয়েছে যা কদর্য ও অপছন্দনীয়। এ জাতীয় স্বভাব-চরিত্রকে আখলাকে সাইয়্যেআ (اَلْأَخْلَاقُ السَّيِّئَةُ) বা কদর্য স্বভাব বলা হয়।

কদর্য স্বভাব হলো, মিথ্যা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, কৃপণতা, গিবত, প্রতারণা, চোগলখোরি বা কুটনামি, হিংসা, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, পদ ও সম্পদের মোহ, ওয়াদা ভঙ্গ, বিদ্রুপ করা, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, অতিরিক্ত ও বেহুদা কথা বলা ইত্যাদি। ভালো স্বভাব-চরিত্র অর্জনের প্রচেষ্টা ইমানি দায়িত্ব। অনুরূপ মন্দ চরিত্র থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা জিহাদের শামিল। মন্দ চরিত্র মানুষের বংশগৌরব, পদ-পদবী, অর্থ-বিত্ত, সনদ-ডিগ্রি সব কিছুকে নিঃশেষ করে দেয়।

সকল মহৎ গুণের এক মহান আদর্শ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

অর্থ : মুসলিমদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী তারাই যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। (জামে তিরমিযি)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. اَلتَّقْوٰى অর্থ কী?

ক. আল্লাহর ভয় খ. জাহান্নামের ভয়

গ. কবরের আযাবের ভয় ঘ. লোক লজ্জার ভয়

২. اَلْعَفْو শব্দের অর্থ কী?

ক. সাহায্য চাওয়া

খ. মাফ করা

গ. উদারতা প্রদর্শন

ঘ. কল্যাণ কামনা করা

৩. اَلتَّوَاضُعُ এর অর্থ কী?

ক. অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট জ্ঞান করা

খ. বিনীত আচরণ প্রদর্শন করা

গ. সবাইকে ভালোবাসা

ঘ. সদাচরণ করা

৪. كَافِلُ الْيَتِيْمِ এর অর্থ কী?

ক. এতিমের অভিভাবক

খ. এতিমের পিতা

গ. এতিমের বন্ধু

ঘ. এতিমের যিম্মাদার ব্যক্তি

৫. ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের মূলশক্তি হচ্ছে -

i. তাকওয়া

ii. আমল

iii. ইবাদত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৬. اَلْأَخْلَاقُ السَّيِّئَةُ অর্থ কী?

ক. অপব্যবহার খ. অনৈতিক আচরণ

গ. অসৎ উপায় ঘ. কদর্য স্বভাব

৭. অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য কয়বার অনুমতি চাওয়া সুন্নত?

ক. ২ বার খ. ৩ বার

গ. ৪ বার ঘ. ৫ বার

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। তাকওয়ার হুকুম কী? উত্তম চরিত্র বা আখলাকে হাসানা বলতে কী বুঝ?

২। اَلتَّوَاضُعُ কী? শিক্ষকের আদব কী? বুঝিয়ে লেখ?

৩। অসচ্চরিত্র কী? এতিমের প্রতি আচরণ কী রূপ হবে? বুঝিয়ে লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অসচ্চরিত্র
اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ

প্রথম পাঠ
বিদ্রুপ করা

বিদ্রুপ করাকে আরবিতে (اَلسُّخْرِيَّة) বলে। বিদ্রুপ করা নিঃসন্দেহে একটি নিন্দনীয় কাজ। ইসলাম আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে। অহংকারবশত অন্যকে ঘৃণা করা কিংবা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ। কাউকে হেয় করার ইচ্ছায় বিদ্রুপ করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এর মাধ্যমে মানুষের অধিকার বিনষ্ট হয় এবং সম্মানহানি হয়। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ.

অর্থ : কোনো সম্প্রদায় অন্য কোনো সম্প্রদায়কে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে না। (সূরা হুজুরাত, ১১)
যাকে বিদ্রুপ করা হয়, সে আল্লাহর নিকট বিদ্রুপকারীর অপেক্ষাও প্রিয়তর হতে পারে।
রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কখনো কাউকে বিদ্রুপ করেননি। তিনি অন্যের ত্রুটি না খোঁজার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَ لاَ تَحَاسَدُوْا وَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

অর্থ : তোমরা পরস্পরে হিংসা পোষণ করো না, পরস্পরে রাগারাগি করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। (সহিহ বুখারি)
মূলকথা, বিদ্রুপ করার কুফল থেকে ব্যক্তি ও সমাজ মুক্ত হলে শান্তি আসে। কাউকে বিদ্রুপ না করে মানবিক মর্যাদা দান করাই মনুষ্যত্ব।

দ্বিতীয় পাঠ
কৃপণতা

কৃপণতা (اَلْبُخْل) মানব চরিত্রের একটি মারাত্মক রোগ। যে রোগ সুস্বাস্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষকে হেয় করে, মান-সম্মানে আঘাত হানে।

আল্লাহ তাআলা বখিলদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَاُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আর যারা নিজ নিজ আত্মাকে কার্পণ্য থেকে মুক্ত করতে পেরেছে তারাই কল্যাণ পথের পথিক। তোমরা কখনও এরূপ ধারণা করো না যে, যারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতে কার্পণ্য করেছে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে, বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক। কিয়ামত দিবসে তারা যে বস্তুতে কার্পণ্য করেছে তা তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (সূরা আল ইমরান, ১৮০)

আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল(ﷺ) বলেন–

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَ لاَ بَخِيْلٌ وَّ لاَ مَنَّانٌ.

অর্থ : ধোকাবাজ, কৃপণ, এবং উপকার করে খোটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এ কার্পণ্য রোগের চিকিৎসা করতে হবে নিম্নরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে–

১। নিজের কামনা-বাসনা লোভ সংযত করতে হবে;

২। মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে;

৩। যেসব বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা যে কোনো সম্পদ কবরে নিয়ে যেতে পারেননি তা নিয়ে চিন্তা ফিকির করতে হবে;

৪। বেশি বেশি কবর যিয়ারত করতে হবে।

তৃতীয় পাঠ
রিয়া বা লোক দেখানো

রিয়া বা লোক দেখানো(اَلرِّيَاء) একটি নিন্দনীয় গুণ। একজন ইমানদারের কথা, কাজ, চিন্তা-চেতনা সবকিছু হতে হবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আত্মপ্রচার, লোক দেখানো ইবাদত বা কর্মে কোনো মূল্য নেই। রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত ও কর্মে ইখলাস ও আন্তরিকতা থাকে না। এসব ইবাদত ও কর্মের দ্বারা আল্লাহর ভয় ও রাসুল (ﷺ) এর মুহাব্বত হাসিল হয় না।

আল্লাহ তাআলা রিয়াকারীদের অভিশম্পাত করে বলেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

অর্থ: সুতরাং ধ্বংস ঐ সকল সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। (সূরা মা'ঊন, ৪-৬)

রসুল (ﷺ) বলেন– আল্লাহর নিকট 'জুব্বুল হুযন' হতে আশ্রয় ও মুক্তি প্রার্থনা কর। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- 'জুব্বুল হুযন' কী? রাসুলে করিম (ﷺ) জবাবে বলেন, 'জাহান্নামের একটি প্রান্তর যা রিয়াকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।'

রিয়া বলতে সহজে বোঝতে হবে যে, ব্যক্তি কোনো নেক আমল করার ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য পোষণ করবে যে, লোকে তার এ সমস্ত আমল দেখুক, মানুষের মধ্যে তার সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাক। রিয়া চাল-চলনে হতে পারে, কথা ও কাজে হতে পারে।

রিয়া থেকে বাঁচার উপায় নিজেকে আল্লাহর একজন নিকৃষ্ট বান্দা মনে করা। মৃত্যুর ভয় মনে সদা জাগরূক রাখা, লোক দেখানো ইবাদত যে কবুল হবে না বরং জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে তা মনে প্রাণে ভালোভাবে উপলব্ধি করা।

চতুর্থ পাঠ
গিবত বা পরনিন্দা

গিবত (اَلْغِيْبَة) শব্দটি غَيْب থেকে উৎসারিত। এর শাব্দিক অর্থ হলো অনুপস্থিত থাকা। গিবত শব্দের অর্থ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা, যদিও তার মধ্যে উক্ত দোষটি বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের কাছে তাঁর এমন দোষের কথা বলা, যা শুনলে মনে কষ্ট পাবে বা লজ্জা পাবে। গিবত শ্রবণকারী, তাতে মনোযোগ প্রদানকারী, উৎসাহ প্রদানকারী সকলেই গিবতকারীর সমপরিমাণ গুনাহগার হবে।

গিবতের অপকারিতা

গিবত সামাজিক সুখ শান্তি বিনষ্ট করে। পরস্পরের মধ্যে ভাল সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। বন্ধুত্ব নষ্ট করে, পরস্পরের আস্থা বিনষ্ট হয়, সমাজে কলহ, ঝগড়া-বিবাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ইসলামি শরিয়াতে গিবত কবিরা গুনাহ ও হারাম। আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করা যেমন জঘন্য, গিবত করাও তেমনি জঘন্য ও ঘৃণার কাজ।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন–

وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

অর্থ : আর তোমরা একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে ভালোবাস ? আর তা তোমরা অবশ্যই অপছন্দ কর। (সূরা আল হুজুরাত, ১২)

গিবত থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়

(১) গিবতকারী নিজের কর্মে লজ্জিত হওয়া, এজন্যে তওবা করা ও অনুতপ্ত হওয়া;

(২) যার গিবত করেছে তার কাছে অনুতাপের সাথে ক্ষমা চাওয়া;

(৩) যার গিবত করেছে তার জন্য ইস্তিগফার করা, তার প্রশংসা করা এবং তার জন্য দোআ করা।

পঞ্চম পাঠ

লোভ ও লালসা

লোভ ও লালসাকে আরবিতে (اَلطَّمَعُ والحِرص) বলে। اَلطَّمَع শব্দের অর্থ অন্তরের প্রবল আশা এবং الحِرص অর্থ লালসা। মন্দ স্বভাবের অন্যতম হচ্ছে লোভ ও মোহ।

অধিক লোভ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এটি মানুষকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে। লোভ লালসা বহু পাপের উৎস। লোভী ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার জন্যে বৈধ-অবৈধ কোনো কিছুরই সে তোয়াক্কা করে না। চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাকের মূলে রয়েছে লোভ। যশ, খ্যাতি, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সীমাহীন লোভ মানুষ কে বিপথগামী করে। লোভ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

ষষ্ঠ পাঠ

হিংসা

হিংসাকে আরবিতে হাসাদ (اَلْحَسَد) বলে। এর অর্থ ক্রোধ, শত্রুতা, হিংসা। নবি করিম (ﷺ) বলেন–

إِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ : হিংসা নেকিসমূহকে এমনভাবে ভক্ষণ করে যেমন অগ্নি কাঠকে জ্বালিয়ে ফেলে।

অন্যের নিয়ামতে বিনাশ হয়ে নিজে তার মালিক হওয়ার কামনা করাই হাসাদ বা হিংসা। আর কারো নিয়ামতের বিনাশ কামনা না করে নিজের জন্যও অনুরূপ নিআমত কামনা করাকে গিবতাহ বা আকাঙ্ক্ষা বলে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

মুমিন ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করে হিংসা করে না।

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক রোগ। মানব সৃষ্টির পর হিংসার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। ইবলিস হজরত আদম (ﷺ)-এর পদ-মর্যাদা দেখে হিংসা করে। ফলে সে অভিশপ্ত হয়। হিংসার বশবর্তী হয়ে হজরত আদম এর ছেলে কাবিল তার আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। হিংসায় অহংকার সৃষ্টি করে, আর অহংকার পতন ঘটায়। হিংসা বর্জনকারী আল্লাহর প্রিয় এবং জান্নাতের অধিবাসী হবে।

সপ্তম পাঠ

ক্রোধ

ক্রোধকে আরবিতে (غَضَب) বলে। ক্রোধ বা রাগ হচ্ছে অন্তরে সুপ্ত একপ্রকার আগুন। যেমন ছাইয়ের নিচে লুকিয়ে থাকে অঙ্গার। ক্রোধ আগুনের অংশ, যে আগুন দ্বারা শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ করে ফেলে। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ক্রোধের কারণে অনেক সময় লজ্জিত ও অপমানিত হতে হয়। তাই ক্রোধ সংবরণ করা উচিত। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

সবচেয়ে বড় বীর সে ব্যক্তি, যে রাগের সময় তার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

অর্থ : এবং যখন তারা ক্রোধান্বিত হয়, তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সূরা শূরা, ৩৭)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ক্রোধের চিকিৎসা হলো أَعُوْذُ بِاللهِ পড়া।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন, যখনই তোমাদের কারো রাগের উদ্রেক হবে, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে পড়বে, বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়বে। এতেও ক্রোধ না থামলে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অযু অথবা গোসল করবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. السخرية। শব্দের অর্থ কী?

ক. খেলা করা
খ. তামাশা করা
গ. বিদ্রুপ করা
ঘ. তোষামোদ করা

২. البخل। মানব চরিত্রের কী?

ক. ভূষণ
খ. স্বভাব
গ. আখলাক
ঘ. বিচরণ

৩. ইসলামি শরিয়তে الغيبة। কী?

ক. ছগিরা গুনাহ
খ. শিরকি গুনাহ
গ. কবিরা গুনাহ
ঘ. কুফর করা।

৪. الحسد। অর্থ কী?

ক. হিংসা
খ. লোভ
গ. লালসা
ঘ. অহংকার

৫. ক্রোধ হচ্ছে –

i. মারত্মক ব্যাধি
ii. অন্তরের সুপ্ত একপ্রকার আগুন
iii. কঠোর মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

৬. الطَّمَعُ والحِرصُ। শব্দের অর্থ কী?

ক. অন্তরের প্রবল আশা ও লালসা

খ. অন্তরের প্রবল হিংসা ও বিদ্বেষ

গ. অন্তরের প্রবল ঘৃণা ও তিরস্কার

ঘ. অন্তরের প্রবল মনোবল ও প্রতিজ্ঞা

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। البخل। অর্থ কী? লোক দেখানো ইবাদত বা কর্মে কোন মূল্য নেই কথা বুঝিয়ে লেখ?

২। الحسد। অর্থ কী? "লোভ মানুষকে ধ্বংস করে" কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

৩। গিবত কী? গিবতের অপকারিতা সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

দোআ ও মুনাজাত

اَلدُّعَاءُ وَالْمُنَاجَاتُ

প্রথম পাঠ

কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে দোআ

দোআ (اَلدُّعَاء) শব্দের আভিধানিক অর্থ ডাকা বা চাওয়া, প্রার্থনা করা। দোআ হলো আদবের সাথে কাকুতি মিনতিসহ আল্লাহর কাছে চাওয়া। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল (ﷺ)-এর ভাষায় যে সব দোআ বর্ণিত হয়েছে, এগুলোকে মাসনুন দোআ বলা হয়।

কুরআনের আলোকে দোআ

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ : তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। (সূরা মুমিন, ৬০)
আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّى قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

অর্থ : আমার বান্দা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (আপনি বলে দিন) আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই- যখন সে আমাকে আহ্বান করে।

(সূরা বাকারা, ১৮৬)

হাদিসের আলোকে দোআ

রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

অর্থ: দোয়া-ই ইবাদত। (আবু দাউদ, ১৪৭৯)

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বহু দোআ শিখিয়েছেন। তার মধ্যে একটি এরূপ–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের এই আমল কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।
(সূরা বাকারা, ১২৭)

দ্বিতীয় পাঠ
কতিপয় প্রয়োজনীয় দোআ

ঘরে প্রবেশ করার দোআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِاسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَ بِاسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللّٰهِ ربنا تَوَكَّلْنَا .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সর্বোত্তম প্রবেশকারী ও সর্বোত্তম প্রস্থানকারী হতে চাই, আল্লাহর নামে আমি প্রবেশ করি ও আল্লাহর নামে আমি বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করি।

ঘর থেকে বের হবার দোআ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (রওয়ানা করছি), আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আল্লাহ ছাড়া (আমাদের) কোনো উপায় ও শক্তি নেই।

সকল প্রকার যানবাহনে আরোহণের দোআ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ إِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ : পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এসব কিছুকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। যদিও আমারা এতে সামর্থ্যবান ছিলাম না। এভাবেই আমরা সবাই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য।

মেধাশক্তি বৃদ্ধির দোআ

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

অর্থ : হে আমার রব! আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন। (সূরা ত্বাহা, ১১৪)

رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى وَيَسِّرْ لِى أَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِى

অর্থ : হে রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জবানের বদ্ধতা খুলে দাও। আমার কথা বোঝার মতো করে দাও।

বদ নযর থেকে সুরক্ষার দোআ

বদ নযর সত্য। সাপের বিষের চেয়েও বদ নযর মারাত্মক। তাই বদ নযর দেখা দিলে নিম্নের দোআটি পড়ে ফুঁ দিতে হয়-

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ. وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণি দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। (বুখারি-৩৩৭১)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ

১. الدعاء শব্দের অর্থ কী?

ক. আরাধনা করা খ. আহবান করা
গ. প্রার্থনা করা ঘ. আলোচনা করা

২. الدُعَاء المَسنُون কী?

ক. সুন্নত সমর্থিত দোআ
খ. হাদিসের ভাষ্যে প্রাপ্ত দোআ
গ. কুরআন বর্ণিত দোআ
ঘ. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষায় যে দোআ

৩. اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَة এর অর্থ–

ক. দো'আ ইবাদতের মগজ স্বরূপ
খ. দো'আই ইবাদত
গ. দো'আ ইবাদতের মাধ্যম
ঘ. দো'আ আল্লাহর সাথে বান্দাহর সম্পর্ক বাড়ায়

৪. السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এ দটি গুণ কার?

ক. আল্লাহর তাআলার

খ. রাসুলের

গ. ফেরেশতার

ঘ. সব নবির

খ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১। সালাতের পর দোআর হুকুম কী? সালাতের পর দোআর নিয়ম লেখ।

২। তোমার পাঠ্যবই থেকে যে কোন একটি দোআ অর্থসহ মুখস্থ লেখ।

৩। বদ নযর থেকে সুরক্ষার ব্যাপারে পাঠ্যবইয়ে লিখিত ১টি আয়াত লেখ।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি : আকাইদ ও ফিক্‌হ

কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে।

– সূরা যিলযাল : ৭

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য